চুপকথা

উপন্যাসের খসড়া

মুহম্মদ জুবায়ের

দেশের জন্য মন-কেমন-করা একটি অতি চমৎকার অনুভূতি। যারা চিরকাল এক জায়গায় কাটায়, স্বগ্রাম বা তাহার নিকটবর্তী স্থান ছাড়িয়া নড়ে না – তাহারা জানে না ইহার বৈচিত্র্য। দূরপ্রবাসে আত্মীয়স্বজনশূন্য স্থানে দীর্ঘদিন যে বাস করিয়াছে, সে জানে বাংলা দেশের জন্য, বাঙালির জন্য, নিজের গ্রামের জন্য, দেশের প্রিয় আত্মীয়স্বজনের জন্য মন কি রকম হু-হু করে, অতি তুচ্ছ পুরাতন ঘটনাও তখন অপূর্ব বলিয়া মনে হয় – মনে হয় যাহা হইয়া গিয়াছে, জীবনে তাহা আর হইবার নহে – পৃথিবী উদাস হইয়া যায়, বাংলা দেশের প্রত্যেক জিনিসটা তখন অত্যন্ত প্রিয় হইয়া ওঠে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়/আরণ্যক

১.

বাংলাদেশে, আমার দেশে, এখন আরেকটি ভোরের আলো ফুটছে। শীতকাল, আমাদের বাড়ির শিউলিতলাটি ভরে আছে শিশিরধোয়া কমলা রঙের আভারঞ্জিত সাদা সাদা ফুলে। গাছের পাতা, বাগানের ঘাসগুলিতে স্ফটিকস্বচ্ছ শিশিরের ফোঁটা। খানিক পরে সূর্যের আলো এসে পড়লে শিশিরবিন্দুগুলি বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। ঘন কুয়াশায় ঢাকা চারপাশ স্বপ্নের মতো অপার্থিব মনে হয়। কুয়াশার ভেতরে অস্পষ্ট একজন মানুষ। মানুষটির মুখ দেখা যায় না, তাঁকে দেখছি পেছন থেকে – গায়ে জড়ানো শাল, মাথায় কানঢাকা পশমী টুপি, মোজাপরা পায়ে কাবলি চপ্পল। মানুষটি আমার পিতা, প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। আমার ছোটো দেশের, পৃথিবীর মানচিত্রে যা প্রায় অদৃশ্য হয়ে থাকে, ক্ষুদ্র একটি শহরের বাসিন্দা তিনি। প্রকৃতপক্ষে তিনি আর সেখানে বাস করেন না – তিনি কোথাও আর নেই, এই জানুয়ারিতে তিন বছর হবে। বহু বছর আগে দেখা এই ছবিটি থেকে গেছে। এখনো কুয়াশাময় শীতের সকালে তিনি তেমনই হাঁটেন দেখি।

কালিকাপুর নামের গ্রামটিতে ক্ষীয়মাণ ও ক্ষীণপ্রাণ নলামারা নদীর ওপারে কুয়াশায় কুয়াশা। নদীর পানির ওপরে ঘন কুয়াশা ভাসে, শীতসকালের অল্প বাতাসে ধোঁয়ার মতো পাক খায়। ঘাটে বসে একজন বয়স্ক মানুষ নিমের দাঁতনে দাঁত মাজেন। মানুষটির পরনে লুঙ্গি, খালি পা, গায়ে ফতুয়ার ওপর জড়ানো আলোয়ান। দাঁতমাজা শেষ হলে ঝুঁকে পড়ে নদীর শীতল পানিতে হাত ডুবিয়ে দেন। আমার মাতামহ। তিনিও আর নেই, অনেকগুলো বছর চলে গেলো। নলামারা নদী হেজেমজে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কবে! তাঁকে দেখি এখনো পৌষের ভোরে কুয়াশার ভেতরে বসে নলামারার ঘাটে দাঁত মাজেন, অজু করেন। এরপর তিনি নিজের ঘরে জায়নামাজ বিছিয়ে একা একা ফজরের নামাজ পড়বেন। লেখাপড়া জানেন না, নিজের নামটি স্বাক্ষর করার মতো অক্ষরজ্ঞানও নেই তাঁর, কিন্তু ধর্মাচরণকে তিনি খুব ব্যক্তিগত করে রাখেন। বয়োজ্যেষ্ঠতার অধিকারে পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-পরিজন কাউকেই এ বিষয়ে কোনো আদেশ দেন না, উপদেশ বর্ষণ করেন না। তিনি যথার্থ বিজ্ঞ ও আধুনিক মানুষ ছিলেন।

পিতামহের গ্রাম দোগাছির খুব কাছাকাছি কোনো নদী নেই, আখের ক্ষেত চারদিকে। এ অঞ্চলের মানুষ আখ বলে না, বলে কুশার। কোন সুদূর এক শীতভোরের সুগন্ধ এখনো ভেসে আসে। কুয়াশাময় তীব্র শীতের ভোরে খোলা মাঠের মাঝখানে অনুচ্চ খুঁটি পুঁতে আড়াআড়ি বাঁশে ঘেরা একটি জায়গায় চুলায়

আগুন জ্বলে। খড়ের আগুনে কুশারের গুড় জ্বাল হয়। আগুনের চারপাশে ঘিরে বসা কয়েকজন মানুষ, তাদের মধ্যে আমার পিতামহকে কি দেখা যায়? মনে পড়ে না। আখগুড়ের সুগন্ধে ম ম করে চরাচর।

তখন আমার বালক বয়স, জয়পুরহাটে চিনিকল হয়নি। চিনিকল স্থাপিত হওয়ার পর এ অঞ্চলের সমস্ত গ্রামে গুড় বানানো নিষিদ্ধ হয়ে যায়, আইন করে বলা হয় সব কুশার বিক্রি করতে হবে চিনিকলের কাছে। গুড় তৈরির সুগন্ধ লুকানো যায় না বলে গোপনেও তা করা সম্ভব হয় না, জীবনভর অভ্যস্ত গুড়প্রিয় মানুষ তখন হুতাশ করে। গুড়ের সেই স্বাদ চিনিতে নেই, তবু উপায় কি! মানুষ মুখ বদলাতে বাধ্য হয়। নিজের জমিতে ঘাম ঝরিয়ে কুশারের চাষ হবে, তা দিয়ে আমি কী করবো তা-ও রাষ্ট্র নির্দেশ করে দেয়। আজ মনে হয়, মানুষের জীবন হয়তো এইভাবে বদলে যেতে থাকে। বালকের মস্তিষ্কে তখনো এইসব বোধ জন্মায়নি। মাঘ মাসের সেই শীতভোরের সুগন্ধ এখন দূরস্মৃতির বেশি কিছু আর নয়। পিতামহ বিগত কতোকাল আগে, আগুনের চারপাশ ঘিরে বসে থাকা কয়েকজন মানুষ গুড় তৈরি হওয়ার অপেক্ষায়, এই ছবিটি অটুট।

এক শীতসন্ধ্যায় তেঁতুলতলার ছোটো মাঠে ব্যাডমিন্টন খেলা। একদিকে বালক একা, প্রতিপক্ষ দু'জন। ছোটো মফস্বল শহরের এই পাড়ায় প্রথম বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে টুর্নামেন্ট হচ্ছে। ডাবল্‌স ম্যাচ, কিন্তু প্রতিপক্ষের দু'জন কোর্টে চলে এলেও বালকের সঙ্গী খেলোয়াড়টি নির্ধারিত সময়ের অনেক পরেও উপস্থিত হয়নি। উদ্যোক্তারা অন্য আরেকদিন ম্যাচটি হতে পারে বলে জানায়। বালক অসম্মত, সে একাই খেলবে। কেউ একজন বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করে, একা দু'জনের বিরুদ্ধে খেলা বোকামি তো বটেই, উপরন্তু প্রতিপক্ষের একজন, আইনুল, সিঙ্গল্‌সে এ শহরের চ্যাম্পিয়ন টানা কয়েক বছর ধরে। বালকের তাতে কিছু এসে যায় না, অনুপস্থিত সঙ্গীর ওপরে রাগ-অভিমানও বোধ করে না। এই মুহূর্তে সে জানে, তাকে খেলতে হবে।

আরো কম বয়সে বালক শুনেছিলো, তেঁতুলতলার বিশাল ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের মাথায় অশরীরী কিছু দেখা যায় চন্দ্রালোকিত রাতে। দিনের বেলায় ঝরে পড়া ছোটো ছোটো শুকনো পাতা আর পাকা তেঁতুলে গাছতলাটি ভরে থাকে। গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখা যায়, ফলন্ত গাছটির পাতা বাতাসে ঝিরিঝিরি কাঁপে। তখন সেদিকে তাকিয়ে কে বলবে এই গাছে কোনো কোনো রাতে অশরীরীরা যাতায়াত করে!

তেঁতুলতলার গা ঘেঁষে প্রাইমারী ট্রেনিং স্কুলের আজিজ স্যারের একতলা বাসা। রাগী বলে খ্যাতি আছে আজিজ স্যারের। অথচ গ্রীষ্মকালের বিকেলে খালি গায়ে লুঙ্গি পরে বারান্দায় একটি চেয়ারে বসে তাঁকে হাতপাখার বাতাস খেতে দেখলে সে কথা বিশ্বাস করার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যেতো না। অবশ্য কথা তিনি কম বলেন, হাসতেও বড়ো একটা দেখা যায় না। একদিন সাহস করে বালক তাঁকে জিজ্ঞেস করে ওই অশরীরীদের কথা। আজিজ স্যার গলা খুলে হেসে বলেন, হামি তা'লে এই গাছতলার বাসাত অ্যাদ্দিন আছি ক্যাঙ্কা কর্যা? বালক সেই একবারই আজিজ স্যারকে অট্টহাস্য করতে দেখেছিলো।

আরেক শীতসকালে পাড়াময় অনুচ্চ স্বরে পাড়াময় রটে যায়, ময়না খুন হয়েছে। ময়না কে? ময়না এই পাড়ারই এক নবীন যুবক। ঠনঠনিয়া মসজিদের পেছনে মানুষজন গিজগিজ করে। তারই ফাঁক দিয়ে নিজের অকিঞ্চিৎকর শরীরটি গলিয়ে বালক সামনে এসে দেখে, একটি প্রায় পত্রশূন্য বৃক্ষের তলায় বুকে ছুরি বেঁধা ময়না চিৎ হয়ে পড়ে আছে। কালচে রক্ত জমাট হয়ে আছে। তার শরীর ঠিক শায়িত নয়, দুই পা পেছনের দিকে মোড়ানো। যেন সেজদায় বসে সামনে উবু না হয়ে উল্টোদিকে শরীর চিতিয়ে বুকে

ছুরি নিয়েছে। ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথাটি একপাশে ফেরানো, চোখ খোলা। যেন কিছু বলে উঠবে এখনি। কিন্তু ভালো করে দেখলে বোঝা যায় তা প্রকৃতপক্ষে মৃত মাছের চোখের মতো। পাথরের চোখ বলে ভ্রম হলেও হতে পারে। বালকের বিস্ময় লাগে, এইভাবে মানুষ খুন হয়? এর আগে কোনো মৃতদেহ সে দেখেনি। আজও দেখতো না যদি তার এই ভিড়ে মিশে আসা কারো জ্ঞাতসারে ঘটতো। এক পাড়ায় বাস করেও ময়নাকে সে আগে কখনো দেখেনি। গাছতলায় হাঁটু মুড়ে পড়ে থাকা নিস্পন্দ প্রাণহীন ময়নাকে কোনোকালে ভুলে যাওয়া হলো না।

চোখের সামনে নেই, আর কখনো দেখা হবে না, এইসকল ছবি আমার হৃদয়ের অতি গহীন অভ্যন্তরে চিরকালের হয়ে আছে।

২.

মস্তিষ্ক, যাকে আমরা সাধারণভাবে সর্বত্রগামী হৃদয় বলে ভাবতে বেশি ইচ্ছুক ও অভ্যস্ত, তার চেয়ে দ্রুতগামী কোনো যান মানুষ আবিষ্কার করেনি। হৃদয়যানের যাত্রী হয়ে অনায়াসে চারপাশের মানুষজনের অজ্ঞাতে মানস-ভ্রমণটি সম্পন্ন করা যায়। কর্মস্থল থেকে ছুটি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না, অফিসে নিজের টেবিল-চেয়ারে বসে সম্পন্ন করা চলে। দূরদেশে, আমার দেশ থেকে পঁচিশ-তিরিশ ঘণ্টার বিমানযাত্রার দূরত্বে এখন আমি, অফিসের কর্মকোলাহলের ভেতরে।

পাশের কিউবিকলে সহকর্মীর স্পীকারফোন অন করা, কনফারেন্স কল। ভিন্ন ভিন্ন টাইমজোনের তিনটি শহরের সাত-আটজন মানুষ কথা বলে অনবরত। একটি কর্মপ্রকল্পে এ-যাবত চিহ্নিত ও সম্ভাব্য সমস্যাবলি নিয়ে যে যার মতামত ও বিশ্লেষণ উপস্থিত করে, নিজের অবস্থান ও ধারণার ব্যাখ্যা দেয়। এই পর্ব সম্পন্ন হলে অতঃপর সর্বজনগ্রাহ্য একটি কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ ও কর্মদক্ষতা অনুয়ায়ী দায়িত্ববণ্টন। এইরকমই হয়ে থাকে, সবই জানা কথা। আমি আজ এই আলোচনার অংশীদার নই বলে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া আমার জন্যে বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু অনিচ্ছায় হলেও শুনতে হয়। শ্রবণপর্বের ভারী ও দায়িত্বপূর্ণ কথাগুলির কিছু আমার কানে আসে, কিছু অধরা থাকে।

জীবিকার জন্যে মানুষকে কোনো না কোনো কর্মে সম্পৃক্ত হতে হয়। আমার মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষাশূন্য মানুষও ব্যতিক্রম থাকে না। এই কর্মে অর্থাগম ঘটে, আহার-বসন-গৃহসংস্থান হয়, জীবনের আয়েশ সহজলভ্য হয়। প্রত্যেকটি সভ্য মানুষের দেওয়ার মতো একটি পরিচয় থাকা প্রথাসম্মত এবং তা প্রধানত কর্মনির্ভর। এখন থেকে হাজার হাজার বছর আগে মানুষ এইসব পরিচয় নিয়ে ভাবেইনি, ব্যক্তিপরিচয় বা পেশাগত কৌলিন্যের ভেদাভেদ নিয়ে তাদের মাথাব্যথা ছিলো না। শিথিল সামাজিক বন্ধনেও তারা যূথবদ্ধ হয়ে থাকতে জানতো। ভাবি, তারা কি অসুখী ছিলো?

আমি যে কাজটি করে জীবনধারণ করি, সেই পেশায় প্রসেস অটোমেশন বলে একটি কথা চালু আছে। অটোমেশন সেই জিনিস যা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষের চেয়ে যন্ত্রের অধিকতর ব্যবহার নিশ্চিত করবে, তোমার জীবনকে সহজ করবে, সময়ের সাশ্রয় ঘটিয়ে উৎপাদন দ্রুততর ও বেশি ফলপ্রসূ করবে। সরল সোজা কথায় তা বলছে, আরো বেশি যন্ত্রনির্ভর হও, আলস্যকে জীবনের মোক্ষ করো। বিস্ময়ের কথা, সুখী হওয়ার জন্যে দরকারি সব উপকরণ আজ মানুষের নাগালে ও নিয়ন্ত্রণে, তবু মানুষ সুখী নয় কেন? সবসময়ই কিছু একটা নেই মনে হয়। আমার চারদিকে তাকিয়ে দেখি, বুঝতে চাই, ঠিক কী নেই যা হলে সত্যি সুখী হওয়া সম্ভবপর হতো।

আমার কর্মস্থলে কেউ জানে না, আমি এখন এখানে নেই। কমপিউটারের মনিটরে চোখ, হাতের অভ্যস্ত আঙুলগুলি কীবোর্ডে নির্ভুলভাবে চলাচল করে, প্রয়োজনে মাউস টেপে। আর সকলের অগোচরে মনে মনে আমার দেশে যাওয়া-আসার খেলা। খেলাটি আমার প্রতিদিনের। কতোবার যে চলে! খেলাই বটে। যা ঘটছে না, ঘটার সম্ভাবনাও নিকটবর্তী নয়, তাকে মনের মধ্যে বাস্তব করে দেখা খেলা ছাড়া আর কি? দয়াহীন বান্ধবশূন্য দূর পরবাসে এইটুকু আমার একেবারে নিজস্ব, কোথাও কোনো জমা-খরচের হিসেব না-দেওয়া লুকানো প্রশান্তির জায়গা। এর মধ্যে কারো কোনো ভাগ নেই, কোনো জবাবদিহি করা নেই, শুধু আমার একার।

এখানে এখন ফুরিয়ে আসা দিন। শীতের দিনে পাঁচটার পরপরই অন্ধকার নেমে আসতে থাকে। অফিসের ভেতরে বসে কিছু টের পাওয়া যায় না, মাথার ওপরে টিউবলাইট জ্বলে দিনমান, দিনরাতের তফাৎ বোঝার উপায় নেই। সময় দেখে বুঝি, বাইরে অন্ধকার নামছে। ঘড়ির হিসেবে বাংলাদেশ সময়ের বারো ঘণ্টা পেছনে আমি। দেশে আজকের খবর কি? নতুন কি ঘটছে?

ঢাকার কাগজগুলো দেখার জন্যে ইন্টারনেটে হানা দিই। আঃ, এই আন্তর্জাল না থাকার কালে দেশের খবর পাওয়া কী দুরূহ ছিলো! সেই সময় বড়ো ধরনের বন্যা-ঘূর্ণিঝড়ের মতো কিছু হলে টিভিতে, স্থানীয় দৈনিকে দু'চার বাক্যের সংবাদ পাওয়া যেতো। না হলে তৎক্ষণাৎ কিছু জানার উপায় ছিলো না, ভরসা ছিলো নিউ ইয়র্কের বাংলা সাপ্তাহিকগুলো। তার জন্যেও আবার সপ্তাহভর অপেক্ষা। আজকাল এখানকার সময়ে দুপুর তিনটার মধ্যেই ঢাকার অনেকগুলো দৈনিক ইন্টারনেটে চলে আসে। ঢাকায় পত্রিকা তখনো প্রেসে, ছাপা শেষ হয়ে বেরোতে আরো কিছু দেরি। ততোক্ষণে দেশের সব খবর পড়া মোটামুটি শেষ হয়ে যায় আমার। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে ঢাকায় ফোন করলে সেখানে তখন সকাল হচ্ছে, অনেকে ঘুম থেকেও ওঠেনি, দৈনিক কাগজের প্রধান খবরগুলো সব আমার জানা। কাউকে দেশের খবর জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হয় না।

আজ সকাল থেকে কাজের চাপ কিছু বেশি, অল্প কিছুদিন আগে তৈরি করা একটি প্রোগ্রামের ত্রুটি মেরামতের কাজে কিঞ্চিৎ পিছিয়ে পড়েছিলাম। তাগিদ ছিলো আজ দুপুরের মধ্যে শেষ করে দেওয়ার। কমপিউটারে প্রোগ্রাম লেখার স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত হয় ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনের পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনে, অথচ তারপরেও ব্যবহারকালে অজানা ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে কারো সম্বিৎ ফেরে – আরে, এই পরিস্থিতিটি আগে কেউ ভাবেনি কেন? বস্তুত মানুষের জীবনের গল্পেও এরকমই হয়ে থাকে, হোক তা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত অথবা রাষ্ট্রীয়। তখন মনে হতে থাকে, আগে ভাবা উচিত ছিলো!

কাগজগুলো এখন দেখবো। দেরি হয়েছে কিছু, তা হোক, ঢাকায় কেউ এখনো কাগজ হাতে পায়নি। রেলস্টেশন, দূরপাল্লার বাস টার্মিনাল বা সদরঘাটে অতি প্রত্যুষের যাত্রীরাও না।

দেশের সংবাদের জন্যে এতো যে আগ্রহ, অধীরতা আমার, অনেকটা হয়তো নেশাগ্রস্তের মতো, কিন্তু কী দেখবো বলে আশা করি প্রতিদিন? স্পষ্ট কোনো উত্তর জানা নেই। ঘটনা-দুর্ঘটনা, হানাহানি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিপুল বিস্তার আর হতাশার খবরে ভরে থাকে কাগজ। দৈনিক দুঃসংবাদ নামে একটি কাগজ থাকলে খুব উপযুক্ত হতো বলে মনে হয়। কাগজে আর থাকে রাজনৈতিক ক্ষুদ্রতা ও অদূরদর্শিতার লজ্জাহীন বিস্তারের সংবাদ – দেশ নয়, দেশের মানুষ নয়, তাদের ভালোমন্দে কিছু এসে যায়না, আমি এবং আমার দলই একমাত্র বিবেচ্য। এইসব দেখে দেখে ভারি ক্লান্ত লাগে, বিষাদে মন ভরে যায়। কখনো এমনও মনে হয়, প্রতিদিন একই খবর পড়ছি। ভাবি, কী হবে আর দেখে, একদিনের কাগজ দেখলে সারা বছরের খবর পাওয়া হয়ে যায়। অথচ পরেরদিন নির্ধারিত সময়ে আবার ইন্টারনেটে না গিয়ে উপায় থাকে না আমার – মনে হতে থাকে আজই হয়তো অন্যরকম কোনো একটি সংবাদ দেখবো। আমার দেশে নতুন ও সুন্দর কিছু একটা ঘটে যাবে আর আমি যথাসময়ে সে সংবাদটি জানতে পারবো না, তাই হয়! বাস্তব এই যে বাস্তবে কিছুই ঘটে না, সুসংবাদের অপেক্ষায় দিনের পর দিন চলে যায়, তবু আমার আশা মরে না। অন্তিম বিচারে আশা নিয়েই হয়তো মানুষ বেঁচে থাকে।

আমার দেশে ডিসেম্বরের আজকের সকালটি অন্যসব দিনের থেকে অন্যরকম। তেত্রিশ বছর বয়সী আমার দেশটির জন্মের সময় আমি সদ্যযুবা। কতো বিসর্জন ও রক্তক্ষয়ের কাহিনী আর বীরত্বগাথায় পূর্ণ ছিলো সেই ডিসেম্বর।

In the grip of this cold December
You and I have reason to remember...

ডিসেম্বরের এই শীতল থাবার অন্তর্গত হয়ে তোমার এবং আমার স্মৃতিমন্থন করার কারণও কিছু আছে! সেদিন আমাদের প্রাণে অর্জনের অহংকার ছিলো, দুই চোখ ভরা স্বপ্নের দ্যুতি ও বিস্তৃতি ছিলো। আকাশতুল্য অনন্ত সম্ভাবনা নিয়ে আমরা টগবগ তখন করছি, আমাদের সামনে কী আলোকময় অলৌকিক একটি ভবিষ্যৎ!

এই দিনে আজ সুদূর মনে হওয়া অনতিদূরের সেই ডিসেম্বরের কথা কি আমাদের স্মরণে আসবে না? মাঝখানের বছরগুলোকে ভাবলে ভুল, ব্যর্থতা ও হতাশার কথা আসবে, তা-ও নিশ্চিত। বিস্মৃত হতে আমরা প্রায়শ সচ্ছন্দ, হয়তো এই বিস্মৃতি না ঘটলে আমাদের দুঃখ-হতাশার আর শেষ থাকতো না, সর্বনাশে সম্পূর্ণ নিমজ্জন অমোচনীয়ভাবে ঘটে যেতে পারতো। তবু ডিসেম্বরের এই দিনটিকে স্মরণ না করে আমাদের উপায় নেই।

আজ আমাদের সেইসব স্বপ্ন ও সম্ভাবনার সবই ভুল ও ব্যর্থ হয়ে গেছে বলে মনে হয়। বস্তুত আমাদের ব্যর্থ স্বপ্নের গল্প অগণন। এতোদিন হয়ে গেলো, তবু কিছু অর্জনের গরিমা নেই আমার দেশের, অর্থ-বিত্তের অহংকার নেই। আছে যতোটুকু, নেই তার থেকে ঢের বেশি। দারিদ্র্য নামে যা আছে অপরিমেয়, তাকে লোকে ভালো চোখে দেখে না, অভাবীদের গৌরব যদি কিছু থাকেও, নিত্যদিনের ক্লিন্নতার আড়ালে তা অনায়াসে ঢাকা পড়ে যায়। তা-ও সহনীয় হতে পারতো, কিন্তু আমার দেশ জগতের সেরা হয় দৈনন্দিন অসততা ও অসদুপায়ের জন্যে। রাজনৈতিক কোলাহলে সে সারা পৃথিবীর নিন্দা কুড়ায়। রাষ্ট্রপ্রধান হত্যায় আমাদের দক্ষতা একসময় রাষ্ট্র হয়ে যায় বিশ্বময়। নিত্যদিনের খুনখারাবিতে মানুষের জীবনই সর্বাপেক্ষা শস্তা ও সুলভ পণ্য হিসেবে প্রতীয়মান হয়। ক্ষমতাধররা লোভ ও নির্লজ্জতার নতুন নতুন শীর্ষ আবিষ্কার করে এবং সেই শীর্ষে তাদের আরোহণপর্বটি ঘটে সাড়ম্বরে, অকম্পিত ও অপরিবর্তিত মুখে। মানুষের কোনো কীর্তি বা সাফল্য নয়, বন্যায়-মহামারীতে-দুর্ভিক্ষে বছর-বছর পৃথিবীর তাবৎ সংবাদপত্রের শিরোনাম হয় আমার দেশ। এতো যে নেই নেই, পর্বতপ্রমাণ আমাদের অক্ষমতা ও ব্যর্থতা, স্বপ্নভঙ্গের বিষাদ – তারপরেও মুখ ফুটে ভালোবাসার কথা বলা কি মানায়!

তবু এই রুগ্‌ণ করুণ অসহায়, ক্ষুদ্র ভুখণ্ডটির জন্যে অতি উচ্চ একটি গৌরবস্তম্ভ ও শর্তহীন ভালোবাসা নিজের ভেতরে যত্নে লুকিয়ে রাখি। দেশটি যে আমার!

আজকের একটি দৈনিকে নিজস্ব প্রতিবেদকের লেখা প্রধান প্রতিবেদন :

> *১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সূর্য উঠেছিল শুধু একটি নতুন দিনের জন্য নয়, বিশ্বের মানচিত্রে একটি নতুন দেশের আগমন সংবাদ নিয়ে। সকালের সূর্য লাল হয়, তবে ৩০ লাখ শহীদের রক্তে রাঙা সেদিনের সূর্য বোধহয় একটু বেশিই লাল*

ছিল। ... ৩৩ বছরে সেই সূর্য আরো একটু লাল হয়েছে, বিজয়ের স্বপ্ন পূরণ না হওয়া, অর্থনৈতিক মুক্তি না আসা আর সরাসরি স্বাধীনতাবিরোধীদের ক্ষমতায় অংশীদার হওয়ার লজ্জায়। ...

প্রথম পাতায় আরো একটু এগিয়ে পাওয়া যায় বিজয় দিবসের বিশেষ রচনা আনিসুজ্জামানের, তিনি লিখছেন :

...সেদিন চোখে যে স্বপ্ন ছিল, বুকে যে বল ছিল, মনে যে আশা ছিল আজ তার কিছুই অবশিষ্ট নেই।

...যে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানিরা সাহস করনি হত্যা করতে, অবলীলায় তাঁকে আমরা মেরে ফেললাম। মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যে-নেতারা – বিশ্বাসহন্তা একজন ছাড়া – তাঁরা সকলে নিহত হলেন আমাদেরই হাতে। চারজন সেক্টর কম্যান্ডার প্রাণ দিলেন আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে।

...নিরীহ বাঙালি একদিন অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল হানাদারকে হটাতে। বীরত্ব সে দেখিয়েছিল বটে। তারপর সেই অস্ত্র হাতে নিয়ে সে হয়ে গেল সন্ত্রাসী। সেই সন্ত্রাসের সঙ্গে প্রবল যোগ অসুস্থ রাজনীতির। আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবন সন্ত্রাস-পীড়িত, সামাজিক আয়োজন সন্ত্রাস-লাঞ্ছিত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সন্ত্রাস-কবলিত। রাষ্ট্র এখন স্বয়ং সন্ত্রাস চালাচ্ছে, নির্বিচারে মানুষ মেরে চলেছে।

১৯৭১ সালে কে ভাবতে পেরেছিল বাংলাদেশে কখনো আসবে সামরিক শাসন? কে ভেবেছিল যে, সাম্প্রদায়িকতা এখানে মাথা তুলবে এত প্রবলভাবে? প্রবল ভেদবুদ্ধি দিয়ে আমরা মানুষকে ভাগ করছি। মুসলমান-অমুসলমানের ভাগ। খাঁটি মুসলমান-নকল মুসলমানের ভাগ। আমার মতে মুসলমান না হলে কিংবা আমার মতো মুসলমান না হলে দখল করো তার মসজিদ, আগুন দাও তার ঘরে। ...এত যে ধর্মের কথা বলছি আমরা, তারপরও তো দুর্নীতি কেবল বেড়েই যাচ্ছে। তাহলে কী নিচ্ছি আমরা ধর্ম থেকে?

...এই ধর্মের কথা বলেই তো পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যা আর সম্পদহরণের যজ্ঞ চালিয়েছিল একাত্তরে। ইসলামরক্ষার নাম করেই তো তাদের এ দেশী সহচরেরা জানমাল কবজ করেছিল, বুদ্ধিজীবী হত্যা করেছিল নির্মমভাবে। একদিনের জন্যেও তারা নিজেদের অন্যায় স্বীকার করেনি, ক্ষমাভিক্ষা করেনি।

...তার পুরস্কারও তারা পেয়েছে। আজ তারা রাষ্ট্রপরিচালনার অংশীদার। বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধা সেনা-কর্মকর্তার পদাবনতি হয়, সেনানিবাসে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু জাতীয় পতাকা ওড়ে স্বাধীনতাবিরোধীদের বাড়িতে-গাড়িতে, সকল স্থান তার জন্যে অবারিত।

...আমি চক্ষুষ্মান, কিন্তু অন্ধ টাইরেসিয়াসের মতো আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পাই না। কী ঘটবে আগামীতে, তা আমার জানা নেই। চারপাশে এখন যা দেখি, তাতে বেদনায় ক্লিষ্ট হই। তাই বারবার ফিরে যাই মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে। সেসব দিনের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে কিংবা যাঁরা কল্পনায় চলে যেতে পারেন সেসব দিনে, তাঁরা যদি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন, তখন কেন আমার ভাই প্রাণ দিয়েছিল, কেন আমার বোন সম্ভ্রম হারিয়েছিল, কী চেয়েছিল সেদিন দেশের মানুষ, তাহলে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যকে আবার জেনে নিতে পারবেন। ...

দুঃসময়ে আনিসুজ্জামানরা সত্য উচ্চারণের সামর্থ্য রাখেন, তাঁরা দেশের মানুষের বিবেক হয়ে ওঠেন। ক্ষীণপ্রাণ, বাকশূন্য মানুষের কথা ও আকাঙ্ক্ষাগুলি তাঁদের লেখায় ভাষা পায়। আর কে আছে যে বলবে এইসব মানুষের কথা? মনে পড়ে, মুক্তিযুদ্ধের সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ওসমানীর মৃত্যুর পরে আনিসুজ্জামানই বলেছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে এই প্রথম একজন মুক্তিযোদ্ধার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলো! বুকের ভেতরে মোচড় দেয়। অন্যমনস্ক হই। বড়ো বেশি স্মৃতি-জাগানিয়া। এইভাবে একে একে সর্বস্ব হারিয়ে ফেলার স্বাধীনতা আমরা চাইনি।

Freedom is just another word for nothing-left-to-lose
Nothing don't mean nothing honey, if it ain't free...

হায়, আমাদের আর কিছুই যে হারানোর নেই!

আজ ডিসেম্বরের এই সকালে বাংলাদেশ জেগে উঠে দেখবে কুয়াশাচ্ছন্ন একটি শীতসকাল।

৩.

অফিস থেকে বেরিয়ে প্রথামতো জালাল ভাইয়ের বাসায় যাই। প্রথাটি এইরকম, প্রতি বছর ডিসেম্বরের ষোলো তারিখটি তিনি উদ্‌যাপন করেন। তাঁর ব্যক্তিগত উৎসব। তারিখটি সাপ্তাহিক ছুটির দিনে পড়লে সারাদিনের, নাহলে সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত। বছর পাঁচেক আগে জালাল ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে আমি প্রতি বছর আমন্ত্রিত। এমন প্রথা দাঁড়িয়ে গেছে যে আগে থেকে বলা-কওয়ার ব্যাপারও নেই, তিনি আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন।

জালাল ভাই দেশে থাকার কালেও কখনো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের কুচকাওয়াজে-উৎসবে যাননি, নিজের মতো করে দিনটি উদযাপন করতেন। একদিন বলেছিলেন, ওইদিন একা একা রিকশা নিয়া দিনভর সারা ঢাকা শহর ঘোরাঘুরি করতাম। যুদ্ধের সময় যেইসব জায়গায় অপারেশন করছি, সেগুলি ঘুইরা দেখতাম, মনে মনে সেই দিনগুলিতে ফেরার চেষ্টা করতাম। সব জায়গাই কমবেশি বদলায়া গেছে, নতুন মানুষজন, নতুন দোকানপাট, বাড়িঘর। কেউ জানে না আমি কে, কি চাই। এইরকম একবার ফার্মগেটে রিকশা থামায়া সিগারেট কিনতে গেছি, তখন আমি সিগারেট খাইতাম, বুড়া দোকানদার আমার মুখের দিকে তাকায়া বলে, আপনেরে চেনা চেনা লাগে। আমি বলি, না চাচা, আমারে চিনবেন ক্যামনে? আমি এই এলাকার না। তখন দোকানদারে বলে, যুদ্ধের সময় এক রাইতে আপনে আমাগো তেজকুনিপাড়ার বাসায় আসছিলেন, আমার পোলা মাইনুল আপনেগো সাথে ইন্ডিয়া গেছিলো। ঠিক কইলাম, চাচা? আমি তখন আর কী বলি, পলায়া যাইতে পারলে বাঁচি। ক্যামনে তারে বলি মাইনুলরে আমার স্পষ্ট মনে আছে, ট্রেনিং নিয়া ফিরা আসছিলাম একই সঙ্গে। সেপ্টেম্বর মাসের দিকে আরো কয়েকজনরে নিয়া কলকাতা যাইতেছিলো কুষ্টিয়ার বর্ডার দিয়া আরো কিছু অস্ত্রপাতি আনার জন্যে। পথে তারা অ্যামবুশে পড়ে, তিনজন নিখোঁজ হয়, মাইনুল সেই তিনজনের একজন। তারা আর কোনোদিন ফিরা আসে নাই, কিছু জানাও গেলো না কি হইছিলো। তো, সেই দোকানদার চাচারে বললাম, মানুষে মানুষে চেহারার মিল তো থাকেই চাচা, আপনার হয়তো ভুল হইতেছে। রিকশায় উঠতে উঠতে বুড়া দোকানদাররে বলতে শুনলাম, আমার ভুল হয় নাই গো, চাচা! আমি ভুলি নাই!

বাংলাদেশের ইতিহাস এবং একাত্তরের যুদ্ধ নিয়ে জালাল ভাইয়ের মতো নিবেদিত ও একাগ্র মানুষ আমি আর দেখিনি। বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন, স্বাধীনতার পরে কয়েক বছরে দলে ক্রমাগত ভাঙনের ফলে ক্রমশ নিরাসক্তি ও নিষ্ক্রিয়তা। বিরাশিতে এরশাদের ক্ষমতা দখলের পর তাঁর মনে হয়, বাংলাদেশ আর নিরাপদ নয়। অনেক উত্থান-পতনের পরেও কখনো সুদিন আসবে, এমন আশা তাঁর জাগ্রত ছিলো, বাংলাদেশের আরো অনেক মানুষের মতো। নতুন করে সামরিক শাসনের শুরু হলে আর আশাবাদী হওয়ার কোনো কারণ তিনি অবশিষ্ট দেখতে পান না।

বলেছিলেন, আপনার মনে আছে, এই লোক গদিতে বসার পরপরই খেলার মাঠের এক গোলমাল নিয়া আবাহনীর চার ফুটবলাররে জেলে ভরছিলো বিনা কারণে?

ঘটনাটি শোনা ছিলো, পত্রিকায় বিস্তারিত পড়েছিলাম। বিরাশির মার্চে নির্বাচিত সরকারকে সরিয়ে দিয়ে সামরিক শাসনের উপহার নিয়ে উপস্থিত এরশাদ। এর মাসকয়েক পরে ঢাকা স্টেডিয়ামে আবাহনী-মোহামেডানের ফুটবল খেলা। শ্রেষ্ঠতার প্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই দলের খেলায় গোলযোগের ঘটনা অনেকবার

ঘটেছে, প্রায়শই ঘটে। এইসব গোলমালে দর্শকে দর্শকে মারামারি, তার ফলে মৃত্যুও ঘটেছে, এমনকি একবার খেলোয়াড়দের হাতে দর্শকের মৃত্যুও ঘটেছিলো বলে মনে পড়ে। বস্তুত এই দুই দলের খেলা নির্ঝঞ্ঝাটে শেষ হওয়া একটি ঘটনাবিশেষ। বিরাশির গ্রীষ্মকালে সেই খেলায় মাঠে দুই দলের কয়েকজন খেলোয়াড়ের মধ্যে হাতাহাতি হয়, তা অচিরে গ্যালারির দর্শকদের মধ্যেও বিস্তৃতি পায়।

জালাল ভাই বলেন, সেইদিন আমি ছিলাম মাঠে, নিজের চোখে দেখা। আনোয়ার আর হেলাল ওই গোলমালে ছিলো, কিন্তু সালাউদ্দিন-চুন্নু তো আশেপাশেই নাই। খেলার মাঠের মারামারি নতুন কিছু না, তার কারণে কাউরে আগে কোনোদিন জেলে যাইতে হয় নাই। ওই চারজনরে ক্রিমিনালদের মতো হাতকড়া পরায়া ঢাকার বাইরে জেলে পাঠাইছিলো। আমার তখনই মনে হয়, এই লোক আরো অনেক সর্বনাশ করবে। আর দেশে থাকা ঠিক না। ওদের ট্রেনে তোলা হইতেছে, সেই সময় কমলাপুর স্টেশন লোকে লোকারণ্য। চুন্নুর সাথে আমার কিছু জানাশোনা ছিলো, আমারে দেইখা ফুঁপাইয়া কান্দে সে। বলে, ন্যাশনাল টীমের প্লেয়ার আমি আজ কতো বচ্ছর, জীবনে কোনোদিন মারামারি দূরে থাক তর্কও করি নাই, তা কে না জানে! ফুটবল খেলার জন্যে হাতে হাতকড়া পরতে হইবো কোনোদিন ভাবছি? বরিশালের পোলা হেলাল দাঁতে দাঁত চাপে আর কয়, একদিন ঠিক দেইখা নিমু সবগুলিরে।

স্ত্রী এবং শিশুকন্যাকে নিয়ে দেশান্তরী হন জালাল ভাই। আমেরিকায় বসতি স্থাপনের বাসনা বা চিন্তা তাঁর আগে কোনোকালে ছিলো না, সুতরাং পেশাগত প্রস্তুতিও কিছু নেওয়া হয়নি। একটি অ্যাকাউন্টিং প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন, ভাবীকেও কাজ করতে হয়। এ দেশে আসার পর একটি পুত্রসন্তান হয়েছে তাঁদের। একজনের রোজগারে সংসার চলে গেলেও ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের জন্যে কিছু করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ভাবীর চাকরিটি সেই ভবিষ্যতের সঞ্চয়। অথচ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত যে কোনো বই, সিনেমা, ফোটোগ্রাফ, গান, পোস্টার, দেশী-বিদেশী দলিলপত্র, সংবাদপত্রের কাটিং তাঁর সংগ্রহ করা চাই-ই চাই। এইসব বিনা পয়সায় হয় না, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের সঞ্চয় ভেঙে করতে হয়। তবু এই সংগ্রহ নিয়ে তাঁর গর্বের অন্ত নেই।

এই শহরে বাঙালি সংগঠনের কোনো অনুষ্ঠান হলে জালাল ভাই অডিটরিয়ামের বাইরে তাঁর সংগ্রহের কিছু অংশ নিয়ে একটি টেবিল সাজিয়ে বসে থাকেন। কৌতূহলী কেউ কেউ এসে সেগুলো নাড়াচাড়া করে, দু'একটি প্রশ্ন করে। পরম উৎসাহে তিনি উত্তর দেন, ব্যাখ্যা করেন। তাতেই পরিতৃপ্ত তিনি, আর কিছু তাঁর চাওয়ার নেই। এইরকম একটি অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। জালাল ভাইকে ঠাট্টা করে আমি পাগল বলি, ভেতরে ভেতরে পরম মমতায় তাঁর কাছে আমার মাথা নত হয়। ভাবীও বুঝে গেছেন, জালাল ভাইয়ের পাগলামি থামানো যাবে না, সেরকম চেষ্টা মানুষটিকে জীবন্মৃত করে ফেলার শামিল।

ভাবী ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেছেন তাঁর বোনের বাসায়। রান্নাবান্না করে রেখে গেছেন। জালাল ভাই জানালেন, ভাবী বলে গেছেন, দুই পাগলের হাতে বাসা দিয়া গেলাম, ফেরার পর কী দেখি কে জানে!

জালাল ভাই তাঁর নতুন সংগ্রহ দেখালেন – বাংলাদেশের যুদ্ধসংক্রান্ত ডিক্লাসিফাই করা মার্কিন সরকারের কিছু দলিলপত্র। একাত্তরে ঢাকায় আমেরিকান কনসাল জেনারেল ছিলেন আর্চার ব্লাড, তাঁর লেখা বই *দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ*, ঢাকা থেকে আনিয়েছেন।

দু'জনে অনেকক্ষণ গান শোনা হলো। জোন বায়েজ-এর *সঙ অব বাংলাদেশ* –

When the sun sinks in the west
Die a million people of the Bangladesh...

যুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে বাজানো হতো, সেইসব গানের সবগুলো তাঁর সংগ্রহে। আপেল মাহমুদ, স্বপ্না রায়, মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, রথীন্দ্রনাথ রায়। *একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি* শুনতে শুনতে আমার চোখ ভিজে আসে।

জালাল ভাই হঠাৎ কী মনে করে শেলফ থেকে জাহানারা ইমামের *একাত্তরের দিনগুলি* বইটি থেকে তাঁর বিশেষ পছন্দের অংশগুলি পড়তে শুরু করেন। জাহানারা ইমামের পুত্র রুমী যুদ্ধযাত্রার জন্যে প্রস্তুত :

...রুমী বলল, 'তোমার জন্মদিনে একটি সুখবর দিই, আম্মা।' সে একটু থামল, আমি সাগ্রহে তাকিয়ে রইলাম, 'আমার যাওয়া ঠিক হয়ে গেছে। ...'

...লোহার সাঁড়াশী দিয়ে কেউ যেন আমার পাঁজরের সবগুলো হাড় চেপে ধরেছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে, চোখের বাইরে, নিঃশর্তভাবে ছেড়ে দিতে হবে। জানতে চাওয়াও চলবে না – কোন পথে যাবে, কাদের সঙ্গে যাবে। রুমী এখন তার নিজের জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, তার একান্ত নিজস্ব ভুবন, সেখানে তার জন্মদাত্রীরও প্রবেশাধিকার নেই।

...রাতে শোবার সময় রুমী বলল, 'আম্মা আজকে একটু বেশী সময় মাথা বিলি করে দিতে হবে কিন্তু।'

জামী বলল, 'মা, আজ আর আমার মাথা বিলি করার দরকার নেই। ওই সময়টাও তুমি ভাইয়াকেই দিয়ে দাও।'

ছোট বয়স থেকেই ঘুমোবার সময় দু'ভায়ের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে হয়। মাঝে মাঝে এ নিয়ে দু'ভায়ে ঝগড়াঝাটিও বাধে। রুমী বলে, 'আম্মা তুমি জামীর কাছে বেশীক্ষণ থাকছ।' জামী বলে 'মা তুমি ভাইয়ার মাথা বেশী সময় বিলি দিচ্ছ।'

আমি রুমীর মাথার চুলে বিলি কেটে দিতে লাগলাম, রুমী 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গানটার সুর আস্তে আস্তে শিস দিতে লাগল।

...জামীকে পাশে বসিয়ে আমি স্টিয়ারিং হুইল ধরলাম। ড্রাইভারকে গতকালই বলে দেয়া হয়েছে, আজ তাকে লাগবে না। পেছনে শরীফ আর রুমী বসল। শরীফের হাতে খবরের কাগজ। খুলে পড়ার ভান করছে।

রুমী বলল, 'সেকেন্ড গেটের সামনে আমি নেমে যাওয়া মাত্র তোমরা চলে যাবে। পেছন ফিরে তাকাবে না।'

তাই করলাম। ইগলু আইসক্রীমের দোকানের সামনে গাড়ী থামালাম। রুমী আধাভর্তি পাতলা এয়ারব্যাগটা কাঁধে ফেলে নেমে সামনের দিকে হেঁটে চলে গেল। যেন একটা কলেজের ছেলে বই খাতা নিয়ে পড়তে যাচ্ছে। আমি হুস করে এগিয়ে

যেতে যেতে রিয়ারভিউ-এর আয়নায় চোখ রেখে রুমীকে এক-নজর দেখার চেষ্টা করলাম। দেখতে পেলাম না, সে ফুটপাতের চলমান জনস্রোতের মধ্যে মিশে গেছে।

...মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস আটকে আসে। মাঝে মাঝে চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে সব কাজ ফেলে ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মাছের মাকে নাকি শোক করতে নেই। চোরের মাকে নাকি ডাগর গলায় কথা বলতে হয়। রুমী যাবার পর উঁচু ভল্যুমে ক্যাসেট বাজানো হয় প্রায় সারাদিনই। সন্ধ্যে হলেই সারা বাড়ীতে সব ঘরে বাতি জ্বেলে জোরে টিভি ছেড়ে রাখা হয়। অর্থাৎ বাড়ীতে বেশ একটা উৎসব উৎসব পরিবেশ। বেশ গান-বাজনা, হৈ-চৈ কলকোলাহল। আশপাশের কোন বাড়ীর কেউ যেন সন্দেহ না করে যে এ বাড়ীর লোকগুলোর বুক খাঁ খাঁ করছে, ব্যথায় কল্‌জেয় টান ধরছে।

আকাশের বুকেও অনেক ব্যথা। তার কিন্তু আমার মত চেপে রাখার দায় নেই। তাই সেও ক'দিন থেকে মাঝে মাঝে অঝোরে ঝরাচ্ছে। না জানি রুমীদের কি কষ্ট হচ্ছে এই বৃষ্টিতে!

পড়তে পড়তে জালাল ভাইয়ের গলা ভারী হয়ে ওঠে, আর পড়া সম্ভব হয় না। চুপ করে সামনের শূন্য দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া দুই পাগলের তখন আর কিছু করার থাকে না।

ফোন বাজছে। জালাল ভাই উঠে গিয়ে ধরেন। ভাবী। দু'একটা কথার পর ফোন আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, সীমা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

হালকা গলায় বলি, আমাদের এতিম কইরা ফালায়া রাইখা গেলেন তো নাইয়োরে। কখন আসবেন?

নাইয়োর গেলে কি আর এতো তাড়াতাড়ি আসা যায়? আসলে যে জন্যে ফোন করছি, আপনের ভাইরে তো চিনি। রান্নাবান্না সব করা আছে, তারপরেও হয়তো আপনেরে না খাওয়ায়া বিদায় করবে। বিশ্বাস তো নাই। পরে বলবে, অ, তুমি রানছিলা নাকি?

আমি না খাইয়া যাওয়ার বান্দা? ঘরে তো আমার জন্যে কেউ রানতে বসে নাই।

ভাবী তাঁর পছন্দের প্রসঙ্গ পেয়ে বলেন, ব্যবস্থা করলেই হয়।

এই খাইছে, এখন তাহলে রাখি। এখনই ভাষণ দিবেন তো!

না না, ভাষণ না। সত্যি চিন্তা করা দরকার আপনের।

আপনেই বলেন, আমার আর বয়স আছে? এই বয়সে কার মেয়ের সর্বনাশ করি কন, তেমন শত্রু তো কেউ নাই। তারপর দুইদিন পর বিধবা হয়া বাপের ঘাড়ে গিয়া তাকে উঠতে হবে। তা কি ভালো কথা?

বিয়া করার কথা বললেই আপনে বুড়া সাজতে চান।

আচ্ছা ভাবী, আমার বুড়া হইতে আর বাকি কি? আজকাল পোলাপানে চুলের মধ্যে খাবলা খাবলা কমলা গোলাপি সবুজ হলুদ সব রং লাগায়া রাখে, বলে হাইলাইট করছে। আরে আমিও তো আমার চুলে

ম্যালা সাদা সাদা হাইলাইট কইরা রাখছি। আগে বলতাম আমার চুল কাঁচা-কাঁচা পাকা, এখন সেগুলি সব পাকা-পাকা কাঁচা।

ভাবী প্রসঙ্গ পাল্টান, আপনাদের পাগলামি কেমন চলে?

ভাবী, মানুষরে কিছু একটা নিয়া থাকতে হয়। আমাদের এই দুই ভাইয়ের আর কী আছে, বলেন?

তা জানি।

ভাবী ফোন রেখে দিলে জালাল ভাই খাওয়ার টেবিলে যেতে বলেন। খেতে বসে জিজ্ঞেস করি, দেশে ফেরার কথা কখনো ভাবেন, জালাল ভাই?

হ্যাঁ, প্রতিদিন ভাবি।

যাইতে চান?

চাই, খুবই চাই। এইখানে আরাম-আয়েশ সব আছে, কারো কাছে জমা-খরচের হিসাব না দিলেও চলে। তারপরেও দিনের শেষে মন হয়, এইসব উঞ্ছবৃত্তি ছাড়া আর কিছু না। এই দেশে আমার দরকারটা কি? দেখেন, খালি আমি একলা না। আমি সামান্য মানুষ, কতো বিদ্বান, প্রতিভাবান বাঙালি পৃথিবীর কতো জায়গায় আছে। তারা দেশটারে কিছু দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, দেশের জন্যে কিছু একটা করার সুযোগ পাইলে এখানে কী আর থাকে? ঠিকই ফিরা যাইতো তারা।

বলি, আপনি যাইবেন?

জালাল ভাই খাওয়া থামিয়ে বলেন, না। চাইলেও আর কোনোদিন হবে না। প্রথম প্রথম ভাবতাম এই দেশে আমি থাকতে আসি নাই, সময় হইলে ফিরা যাবো নিজের মাটিতে। কিন্তু ছেলেমেয়েগুলি বড়ো হইতে হইতে আমার গলার জোর কমতে থাকে, মনে হয় এদের বাংলাদেশে নিয়া আমি কী জীবন দিতে পারবো, কী নিরাপত্তা দিতে পারবো? আর নিজেরও বয়স হইতেছে, এই বয়সে দেশে গিয়া নতুনভাবে শুরু করার সাহস পাই না, বুঝতে পারি না আমি কী কাজ নিয়া জীবনধারণ করবো, ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে পারবো। আমরা দুই বুড়াবুড়ি না হয় জানি বাংলাদেশের জীবন কী, কিন্তু ছেলেমেয়েগুলি তো সেই জীবন জানে না, তাতে অভ্যস্ত হয় নাই, তাদের জন্যে খুব কষ্টেরই হবে। তাদের সেই অনিশ্চিত জীবনের মাঝখানে ফেলার কী অধিকার আমার আছে?

আমার নিজের কথা ভাবি। আমার ছেলেমেয়ে বা সংসারের দায় নেই, তবু আমার দেশে ফেরা হবে না। জালাল ভাই এসব নিয়ে কখনো প্রশ্ন করেন না, কৌতূহল প্রকাশ করেন না বলে রক্ষা। আমিও এই বিষয়ে আগে কখনো তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

জালাল ভাই বলে যান, আর আমার দেশটারে কি এখন আমি আর চিনতে পারবো? যা শুনতে পাই তাতে মনে হয় এই দেশ তো আমরা চাই নাই। আমি জানি দেশ নিয়া যা ভাবি, যেসবে বিশ্বাস করি – সেসব বিষয়ে মুখ বন্ধ না রাখতে পারলে অসুবিধা হইতে পারে, বিপদ ঘটতে পারে। সেইগুলি উপেক্ষা করার বয়স বা সাহস আমার নিজেরও আর নাই। শেষ কথাটা এই যে, জীবনভর দেশে ফেরার ইচ্ছাটা থাকবে, তা নিয়া হয়তো কখনো ভাবনাচিন্তাও করবো, কিন্তু ফেরা আর হবে না। ওই ইচ্ছাটা নিয়াই মরতে হবে, আমি জানি।

৪.

বছরের কতকগুলো তারিখ কিছুতেই ভুল হয় না, ঠিক ঠিক মনে পড়ে যায়। ক্যালেন্ডারের তারিখ শুধু নয় সেগুলি, তারা আমার স্মরণের উপলক্ষ তৈরি করে। আমি উৎসব উদযাপনের আনুষ্ঠানিকতায় শামিল হতে স্বচ্ছন্দ বোধ করি না। আমার উদ্‌যাপন ব্যক্তিগত, আমার নিজস্ব। তার কিছু আমার দেশের ইতিহাসের অংশ – যেসব সবার জানা। একুশে ফেব্রুয়ারিকে কে ভুলবে? এখন তা সারা পৃথিবীর উদযাপনের দিন। স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস? সবাই মনে রাখে কিনা জানি না। আমি রাখি, ভুল হয় না। নির্দিষ্ট দিনে মনে মনে উদ্‌যাপন করি, শোক পালন করি।

কোনো কোনো দিবস আমাদের রাষ্ট্রীয় কলঙ্কের, তা-ও ভুলে যাই না। শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের দিন ভুলি না। জীবিত থাকলে শেখ মুজিব এখন হতেন অশীতিপর বৃদ্ধ। কেমন দেখতে হতেন তিনি? তাঁর তেজস্বী দৃপ্ত ভঙ্গিটি বা হাস্যময় মহিমাদীপ্ত ছবিটি দিয়ে তাঁকে চিনেছি। আশি বছরের বৃদ্ধ হিসেবে তাঁকে ভাবা যায়! কেমন হতো আজকের বাংলাদেশ তিনি জীবিত থাকলে? আমার কল্পনাশক্তি অতোদূর যাওয়ার সামর্থ্য ধরে না।

সামরিক পোশাকে ক্ষমতায় আবির্ভূত হলেও জিয়া রাষ্ট্রপতি ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধাও। তাঁর হত্যাকাণ্ড আমাদের কোনো গৌরব দেয়নি। মুক্তিযুদ্ধে শরীরের একটি অংশ উৎসর্গ করেছিলেন বীর যোদ্ধা কর্নেল তাহের, তাঁর ফাঁসির বার্ষিকীতে কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতার লজ্জায় আমি কুঁকড়ে যাই। কারাগারের আপাত-নিরাপদ কুঠুরিতে তাজউদ্দিন-সৈয়দ নজরুলদের হত্যার পৈশাচিকতা আমার দুঃস্বপ্নের কারণ হয়ে থাকে। বিরাশির চব্বিশে মার্চে বন্দুক হাতে আরেক বীরপুরুষের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লজ্জার দিন।

কোনো কোনো দিবস আমার নিজস্ব। সেইসব দিনে আমি সেদিনের অনুষঙ্গ ও ঘটনাগুলিকে জীবন্ত করার চেষ্টা করি, স্মৃতি হাতড়াই। আমার বাল্যকালে আমাদের বাড়িতে জন্মদিন পালনের রেওয়াজ ছিলো না, পরেও তা সেভাবে কেক কাটার উৎসব হয়ে ওঠেনি। আমাদের ভাইবোনদের জন্মদিনে খাওয়া-দাওয়া একটু বিশেষ রকমের হতো, সঙ্গে পায়েস বা খেজুরগুড়ের ক্ষীর। এখনো জন্মদিনটি মনে থাকে, কিন্তু তা অন্য আর যে কোনো দিনের থেকে আলাদা কিছু নয়।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন শুধু পেছন ফিরে দেখে বিস্মিত হওয়া – এতোগুলো বছর হয়ে গেলো, এবং আমি এখনো জীবিত! কীভাবে সম্ভব হলো? মৃত্যু অতি নিকটবর্তী হয়েছিলো একবার, তারিখটি নভেম্বরের আঠারো। সাল ঊনিশশো একাত্তর। আমার বয়সের হিসেব হয়তো সেই দিনটি থেকেও করা চলে। জীবিত ফিরে আসার কথা ছিলো না সেদিন। অলৌকিক মনে হয়, হয়তো রক্ষা পেয়েছিলাম অন্য কারো জীবনের বিনিময়ে, আমাদের দলের আটজনকে সেদিন হারাই আমরা। কোনোকিছুর বিনিময়েই যুদ্ধদিনের সেই দিনগুলিকে ত্যাগ করতে আমি অনিচ্ছুক, এমনকী একটি নতুন জন্মও নয়। দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের অংশীদার হওয়া যে কী বিশাল, বিপুল গর্বের জিনিস, পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ তার স্বাদ কোনোদিন পাবে না, জানবে না। আমি জেনেছি। এই অহংকারের তুলনায় আর সবকিছুই আমার কাছে অপ্রধান ও স্বল্পতর গুরুত্বের।

আবুল হাসান আমার প্রিয় কবি। বাহাত্তরে নিজের প্রথম প্রকাশিত কবিতার বইটি মাকে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন, *আমার মা, আমার মাতৃভূমির মতোই অসহায়*। পঁচাত্তরের ছাব্বিশে নভেম্বর এই তরুণ কবি পৃথক পালঙ্কে শায়িত হয়েছিলেন। বছর বছর এই দিনটি আমার ঠিক মনে পড়ে যায়।

মে মাসের সাতাশে আমার জীবনে এইরকম একটি অবিস্মরণীয় দিন। চুয়াত্তরে এই দিনে মুনিয়া নামের আশ্চর্য একটি মেয়ের সঙ্গে জীবনের প্রথম প্রেমমূলক সম্পর্কের সূচনা ঘটেছিলো। সে আমার হয়েছিলো অতি অল্পকালের জন্যে। হয়তো এরকম একটি সম্পর্কের জন্যে অথবা অনতিবিলম্বে আমার জীবন বদলে যাওয়ার মতো কিছু ঘটনার জন্যে আমরা ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। মুনিয়া আমার জীবনের অভ্যন্তরে আর নেই, কিন্তু এখনো আছে সে। এই পৃথিবীতেই। তার সঙ্গে শেষবার দেখা পঁচাত্তরে, ডিসেম্বরের সাত তারিখে। যেদিন আমি দেশান্তরী হই।

এই যে মনে হলো মুনিয়া আমার হয়েছিলো অতি অল্প সময়ের জন্যে, আসলে ভালোবাসার জন কি কখনো অল্প সময়ের জন্যে আপন হতে পারে? তার সঙ্গে সারাজীবন অতিবাহিত করতে পারলে কীরকম হতো জানি না, এ জীবনে তা জানার আর উপায় নেই। বাস্তবে তা ঘটলে তারপরেও মনে হতে পারতো, হায়, জনমভর ভালোবেসেও যে মানুষের সাধ মেটে না! ভাবতে ইচ্ছে হয়, পরবাসী না হলে আমার, আমাদের জীবন কীরকম হতো!

আমার অন্তর কালা করলাম রে, দুরন্ত পরবাসে...

৫.

ডায়েরি লেখা আমার হয় না। অনেকে বলে থাকেন, ডায়েরিতে বেশিরভাগ মানুষ সত্যি কথা লেখে না। প্রতিভাবান ব্যতিক্রম অবশ্য আছেন, তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু গড়পড়তা মানুষ নিজে যা নয় তাই ডায়েরিতে লিখে রাখে। লেখার সময় তারা কল্পনায় একজন অচেনা পাঠককে দেখতে পায়, সুতরাং সেই পাঠকের কাছে নিজেকে মহৎ ও মহান হিসেবে উপস্থাপন করা তখন জরুরি হয়ে ওঠে।

আমি নিজে এই দুই প্রকারের কোনোটিই হতে পারিনি। তেমন করে লেখার প্রতিভা ও সামর্থ্য সকলের থাকে না, আমারও নেই। আর মিথ্যা লেখার আশংকা থেকেই সম্ভবত আমার ডায়েরি লেখার আগ্রহ হয় না। দেশ ছাড়ার সময় এক বন্ধু, কী মনে করে কে জানে, মজবুত বাঁধাই করা একটি খাতা উপহার দিয়েছিলো। এ ধরনের খাতা তখন বাংলাদেশে কিনতে পাওয়া যেতো না, এখন হয়তো যায়, ঠিক জানি না। কোথা থেকে যোগাড় করেছিলো, সে-ই জানে। প্রথম পাতায় বন্ধুটি গোটা গোটা অক্ষরে পাবলো নেরুদাকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করে দিয়েছিলো :

For some reason or other, I am a sad exile.
In some way or other, our land travels with me
And with me too, though far, far away, live the longitudinal essences of my country.

উদ্ধৃতিটি আগে লক্ষ্য করে দেখিনি, দেশান্তরী হওয়ার উদ্বেগসংকুল ব্যস্ততার মধ্যে স্যুটকেসে ঢুকিয়ে ফেলেছিলাম। পঙক্তিগুলি নেরুদার রচনা, তা-ও জানা ছিলো না। বন্ধু উদ্ধৃতি লিখেছিলো, সূত্রটি উল্লেখ করেনি। পরে জানা হলো চিলির প্রবাসী লেখক ইজাবেল আলেন্দের *মাই ইনভেন্টেড কান্ট্রি* বইয়ে উদ্ধৃত দেখে। ইনভেন্টেড কান্ট্রি! নামকরণেই চমক লাগে, লেখকের নামের শেষাংশে আলেন্দে পদবীটিও অন্য এক অনুরণন তোলে। যৌবনকালে আমরা যারা একটি সাম্যবাদী রাষ্ট্র ও যূথবদ্ধ পৃথিবীর স্বপ্নে নিমজ্জিত ছিলাম, চিলির সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক সালভাদর আলেন্দে তাদের আত্মীয়সম মানুষ ছিলেন। সালভাদরের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইজাবেল। সামরিক উর্দিধারী পিনোশের নেতৃত্বে সালভাদর আলেন্দে নিহত হন ১৯৭৩-এর ১১ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার। সামরিক একনায়ক পিনোশেকে সমর্থন ও সহায়তা দেয় মার্কিন গোয়েন্দাসংস্থা সিআইএ। আশ্চর্য, ঠিক বত্রিশ বছর পর সেই আমেরিকাই আক্রান্ত হয় ২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বর। সেদিনও মঙ্গলবার! কাকতালীয়, নাকি নিয়তি-নির্ধারিত?

সালভাদর নিহত হলে আলেন্দে পরিবারভুক্ত কারো পক্ষে চিলি তখন আর বাসযোগ্য ও নিরাপদ হওয়ার কথা নয়। ইজাবেলকে তাঁর জন্মভূমি ত্যাগ করতে হয়, এখন আমেরিকার বাসিন্দা তিনি। চিলিতে সশরীরে বাস না করলেও দেশটি এখনো তাঁর হৃদয়ে, নিজেকে তিনি চিলির মেয়ে হিসেবেই দেখেন এখনো। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাকে একাকার করে কল্পনায় একটি নতুন দেশ নির্মাণ করে নিয়েছেন, যাকে তিনি বলছেন ইনভেন্টেড কান্ট্রি।

চিলির ভৌগোলিক অবস্থান এবং তুষারময় পর্বতমালা ও দীর্ঘ সমুদ্রতটের বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে দেশটির সঙ্গে আমার দেশের কী আশ্চর্য সাদৃশ্য। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে চিলির বয়স প্রায় পৌনে দুশো বছরের। তার সমাজ, ইতিহাস, দেশের মানুষ ও তাদের সংগ্রাম, সামাজিক সংস্কার – সবই আমার দেশের সঙ্গে তুল্য। তারাও বন্যা-জলোচ্ছ্বাসের মতো দুর্যোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকে। আমার দেশের মতোই সে দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন, বিভাজন ও বিশৃঙ্খলা। রাজনীতি ও এককালের ক্ষমতা বদলের সামরিক পদ্ধতিটিও। চিলির আলেন্দের সমসাময়িক ও সমগোত্রীয় আমার দেশের প্রধানতম নেতা, শেখ মুজিব, সালভাদরের দু'বছর পর নিহত হয়েছিলেন, সপরিবারে। বাঙালি জাতির জন্যে একটি পৃথক রাষ্ট্রের নির্মাতা এইভাবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন, তা-ও আমেরিকার সৌজন্যে।

আরো একটি বিষয়ে চিলি কিছু আলাদা। সে দেশে ধর্মবিশ্বাসী মানুষ প্রচুর আছে, সম্ভবত বেশির ভাগ মানুষই তাই। ধর্ম নিয়ে উন্মাদনা নেই তা-ও নয়, কিন্তু এক ধর্মের মানুষরা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে বিতাড়ন বা নির্মূল করতে তৎপর হয় না, তাদের বিধর্মী বলে ঘোষণা দেয় না। ধর্ম বিষয়ে অবিশ্বাস স্থাপন করলে দেশত্যাগী হতে হয় না, প্রাণসংশয় ঘটে না। আজ শুনি আমার দেশে এই ধর্মোন্মাদদের অব্যাহত ও ক্রমবর্ধমান দাপট। তারপরেও জানি, বিশ্বাস করি, আমার দেশের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষ এই উন্মাদনা ও দাপটের ভুক্তভোগীমাত্র – তার অংশীদার নয়।

বন্ধুর দেওয়া খাতার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, একদিন অকস্মাৎ খাতাটি আমার হাতে উঠে আসে, যেন বিস্মৃতির ভেতর থেকে। উদ্ধৃত চরণগুলি পড়ে শিহরিত হই, এসব তো আমার কথা। সম্ভবত কবিরাই অন্যদের কথা এমন সুন্দর করে বলতে পারেন, যেন তা হৃদয় মুচড়ে দেওয়া একটি দীর্ঘশ্বাস!

খাতাটি কী কাজে ব্যবহার করা যায়, ভাবি। সাদা পাতাগুলো অপেক্ষায় আছে। মনে হয়, আমার বন্ধু খাতাটি অপাত্রে দান করেছে। লেখক বা কবি এমনকী চিত্রকর হলেও কাজে লাগানো সম্ভব হতো। আমি এখন কী করি? কিছু না ভেবে একদিন নিজের মনে লিখতে শুরু করি। আমার নিজের সব কথা। কোনো কোনো কথা আছে, অন্য কারো সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায় না। আর আমি ভাগাভাগি করবো কার সঙ্গে? এই ডালাস শহরে বাস করি আজ পঁচিশ বছর। এ দেশীয় স্থানীয় অনেকের সঙ্গে কর্মসূত্রে বা অন্য কোনোভাবে পরিচয় ঘটেছে, তারা কেউ আমার বন্ধু নয়। আমি তাদের কতোটা বুঝবো, তারাই বা আমাকে কতোটা? ভাষা বোঝা গেলেও পরস্পরের সংস্কৃতি ও সামাজিকতার রীতিসমূহ অজানা থাকে, পারিবারিক ধ্যানধারণা ও আচার অবোধ্য থেকে যায়। গাত্রবর্ণের পার্থক্যও একটি বিষয় বটে, মার্কিন দেশীয় সাদা ও কালোদের চিরকালীন বিভাজন আজও খুব বেশি জীবন্ত।

স্বগোত্রের মানুষদের সঙ্গেও আমার জমেনি। এই শহরে যখন আসি তখন এক হাতের আঙুলে বাঙালি গোনা সম্ভব হতো। পরে মানুষজন অনেক বেড়েছে, তবু চেনাজানা বেশি হয়নি। এর আগে নিউ ইয়র্কে কেটেছে বছর চারেক, সেখানেও অন্যরকম কিছু ঘটেনি। দোষ অবশ্য অন্য কারো নয়, আমারই। আমি লক্ষ্য করি, মানুষ বড়ো বেশি অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে পছন্দ করে, অহেতুক কৌতূহলী তারা। আমি সবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি – তারা কি বলে শুনবো, তাদের কথা বুঝবো বলে। জানতে চাই তারা কে, কী তাদের অভীষ্ট বা গন্তব্য। কিন্তু সখেদে টের পাই, অনেক কথা বলেও তারা আসলে কিছুই বলে না। তারা নতুন মডেলের গাড়ির কথা বলে। বাড়ির মর্টগেজে সুদের হার নিয়ে বিতর্ক করে। স্যুট-টাই ও স্বাস্থ্যবীমা বিষয়ে কথা বলে। বাংলাদেশ থেকে এখানে অবতীর্ণ হয়ে তারা কে কতোটা আমেরিকান হয়ে উঠতে পারলো তা ইংরেজি ভাষায় অনর্গল বলে অসংকোচ গর্বে। কয়েক বছর আগেও ছিলো না, সম্প্রতি

যুক্ত হয়েছে, কারণে-অকারণে ধর্মবিষয়ক কচকচানি – একে অন্যের চেয়ে কতোবেশি পরিমাণ ধার্মিক তার সবিস্তার বয়ান এবং অন্য অল্পপ্রাণ, স্বল্পবুদ্ধি ও গুনাহগার মানুষদের করণীয় কি, তার পাঠক্রম।

একই কথা ক্রমাগত বলে যায় তারা, কেউ অন্য কারো থেকে আলাদা কিছু শোনায় না। আর আছে বোধবুদ্ধিহীন ও স্থূল কৌতুকের অনিঃশেষ ভাণ্ডার – তরল, গরল, ইতর, অশ্লীল ও রুচিহীন। দেশের কথা বলতে তাদের প্রচুর উৎসাহ, অথচ তারা শুধু নিরাশার কথা বলে, আমার দেশটি কতো বিচিত্ররকমভাবে এবং কেন আর বাসযোগ্য নয়, আমেরিকার তুলনায় আমার দেশটি একটি জঙ্গলবিশেষ – সেইসব কথা। অবধারিতভাবে থাকে রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধির কাহিনী ও যুক্তিবর্জিত উচ্চকিত তর্ক। হয়তো আমারই ভুল, আমি মানুষের কাছে খুব বেশি আশা করি। ভুলে যাই, শুধু আমার দেশের মানুষ নয়, পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই এইসব দিনানুদৈনিকের গল্পে নিবিষ্ট হয়ে থাকে। সর্বদা তারা আমোদিত হতে চায়, বিনোদনের সন্ধান করে। এইসব কথাও তাদের একরকমের বিনোদন বটে।

আমি আসলে যে কী শুনতে চাই খুব স্পষ্ট করে কি জানি? যা শোনার জন্যে আমি অপেক্ষা করি, তা এইসব নিচের তলার জিনিস নয়। এইসব দিয়ে মনুষ্যজাতির বা পৃথিবীর বিশালত্ব বোঝা যায় না। আমি শুনতে চাই মানুষের অর্জনের কথা। মনুষ্যজীবনের সংগ্রাম, অর্থপূর্ণতা, সুন্দরতর বিষয়সমূহ ও অনিত্যতার কথা। অকল্পনীয় বিশাল আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাসিন্দা হিসেবে আমার বা আর যে কোনো একক ব্যক্তির অকিঞ্চিৎকরতার স্বীকারোক্তি ও উপলব্ধি। বিদেশে বসবাসের সংগ্রাম ও যাতনার কথা শুনতে চাই। দেশের জন্যে স্ফুরিত অহংকার ও ভালোবাসার উৎসারে আমার আগ্রহ। ক্ষুদ্র রাজনীতি ও ধর্মীয় উন্মাদনার বাইরে যে দেশ, সেই বৃহৎ বাংলাদেশের সমষ্টিগত আকাঙ্ক্ষা আর ভবিষ্যতের কথা শুনতে চাই। এইসবই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক জ্ঞান করি।

আমি যেসব কথা অন্য মানুষদের মুখে শুনি না, যে কথাগুলো আমার বলা হয় না, শোনারও কেউ নেই – সেইসব আমি নিজের মতো করে নিজেরই জন্যে লিখে যাই। এইসব আমার নিজস্ব ভাবনার কথা, আমি ভাগাভাগি করি এই খাতার সঙ্গে।

জালাল ভাইয়ের বাসা থেকে বেরোতে বেশ রাত হয়ে যায়। নিজের ঘরে ফিরে ফোনের কলার আই ডি দেখি, অচেনা দুটো নাম্বার। অ্যানসারিং মেশিনে কোনো মেসেজ নেই। কাপড় পাল্টে হাতমুখ ধুয়ে নিই। মাঝেমধ্যে দেশ থেকে পুরনো বন্ধুবান্ধব ফোন করে, তার জন্যে আমি অপেক্ষা করে থাকি। আর অপেক্ষা মুনিয়ার ফোনের জন্যে। জানি কোনো কারণ নেই, তবু আশা করি। এমন নয় যে নিয়মিত ফোন করতে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। মাঝেমধ্যে আচমকা ফোন করে সে, এসএমএস পাই, ইমেলও কদাচিৎ। গত দু'সপ্তাহ কিছুই আসেনি। তার ঘরসংসারের ব্যস্ততা আছে, নিজস্ব জীবনবলয় ও প্রাত্যহিকতার দায় আছে। সেসব সম্পূর্ণ হলে তারপরে সুযোগমতো আমাকে ফোন করা তার সম্ভব হয়। ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী দেশ থেকে এখানকার সময়ের পার্থক্যও হিসেবে রাখতে হয়। এই যোগাযোগ পুরোটাই মুনিয়ার নিজের শর্তে, সেটিই সঙ্গত, আমার মতো দায়শূন্য জীবন তার নয়। আমার বিশেষ কোনো অনুযোগও অবশ্য নেই। এইটুকু যোগাযোগও তো থাকার কথা ছিলো না, আছে এই ঢের!

এক শয়নকক্ষবিশিষ্ট আমার এই ছোটো অ্যাপার্টমেন্টটি একা মানুষের জন্যে আদর্শ। ঢাকার জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ে একা একটি কক্ষের মালিকানা পাওয়া হয়ে ওঠেনি, তার আগেই দেশত্যাগী হয়েছি। নিউ ইয়র্কে একা বাসা ভাড়া করার সামর্থ্য ছিলো না, ভাড়া সেখানে অতিশয় বেশি, দুই বেডরুমের একটি বাসায় চারজন ভাগাভাগি করে থাকা। এই শহরে আসার পর নিজের মতো করে একা থাকার সুযোগটি

আসে। মূল শহরের একটু বাইরে এই অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে আমার বাসা দোতলায়, পুব-উত্তর ফাঁকা। শয়নকক্ষের উত্তরের জানালা খুলে দিলে দেখা যায়, কিছু ফাঁকা জায়গা ছেড়ে ছোটো লেকসহ একটি পার্ক। জগিং ট্রেইলও আছে। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে পার্কের বেঞ্চে বসে খানিকটা সময় কাটানো যায়। আমার প্রাতঃভ্রমণে উৎসাহী হয়ে ওঠার পেছনে বড়ো বড়ো গাছপালায় ঢাকা এই পার্কেরও একটি ভূমিকা আছে। মৌসুমী ফুল ফোটানো হয় যত্ন করে, বসন্তকালে বুনোফুলের প্রতাপ। পূর্ণ চাঁদের রাতে গিয়ে দেখেছি, লেকের শান্ত পানিতে নরম আলো ছড়িয়ে যায়, চাঁদের আলোয় বড়ো বড়ো গাছের ছায়া পড়ে থাকে সেখানে, চারপাশ ঘিরে থাকে বইয়ে পড়া রূপকথার মতো মায়াবী রাত। এই সময়ে আমার অবধারিতভাবে আরেকটি রাতের কথা স্মরণ হয়।

Can you hear the drums, Fernando?
I remember long ago another starry night like this
In the firelight, Fernando
You were humming to yourself and softly strumming your guitar
I could hear the distant drums
And sound of bugle calls were coming from afar
They were closer now, Fernando
Every hour every minute seemed to last eternally
I was so afraid, Fernando
We were so young and full of life and none of us prepared to die
And I am not ashamed to say
The constant roar of cannons almost made me cry
There was something in the air that night
The stars so bright, Fernando
They were shining there for you and me
For liberty, Fernando
Though I never thought that we could lose
There's no regret
If I had to do the same again
I would my friend, Fernando…

যুদ্ধের সময় শেষ হেমন্তের একরাতে দেখা হয়েছিলো অপার্থিব পূর্ণ চাঁদের রাত। ঠিক মাথার ওপরে পরিষ্কার নীল আকাশের গা বেয়ে অঝোরে ঝরা চাঁদের আলোয় চরাচর ধুয়ে যাচ্ছিলো। বিগত-বর্ষার শীর্ণকায় নলামারা নদীর পাড়ে সাদা বালুকারাশি চাঁদের আলোয় মহার্ঘ্য ধাতুর মতো চকচক করে। আলোয়ানের তলায় সশস্ত্র আমরা পাঁচজন। দলনেতা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র মাজেদ, তার কাছে স্টেনগান আর দুটি হ্যান্ড গ্রেনেড। নজরুল, আকবর, প্রণব আর আমার কাঁধে রাইফেল। আরো একজন আমাদের সঙ্গী, তবিবর, আমাদেরই বয়সী নৌকার মাঝি, তার হাতে লগি ও বৈঠা। নদীর ঘাটে বাঁধা ছোটো একটি ডিঙি নৌকা। দলনেতা ছাড়া গন্তব্য আমাদের কারো জানা নেই, তাতে কিছু

আসে যায় না। আমরা নিঃশব্দে নৌকার দিকে হাঁটি। এমন মনোহর চাঁদের রাত আর কখনো কি দেখবো? মনে হয়, এই অপরূপ দৃশ্যের জন্যে পৃথিবীতে বারংবার ফিরে আসা যায়।

এই পৃথিবীতে আমার বসবাস খুব অল্প দিনের নয়, পূর্ণ চাঁদের রাত আরো কতো শত শতবার দেখা হয়েছে, অথচ সেই রাত্রির সঙ্গে আর কোনো রাতের তুলনা হয় না। তেমন অলৌকিক ও মায়াবী চাঁদের রাত আর কোনোদিন দেখা হয়নি। হবে না। অপরিমেয় জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া একটি হেমন্তরাত আমার সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে থেকে গেলো।

আমার শয়নকক্ষে মাঝারি বিছানা, বইয়ের শেলফ আর কমপিউটারসহ পড়ার টেবিল। লাগোয়া বাথরুম, ক্লজেটে কিছু কাপড়চোপড়। বসার ঘরে কোনোমতে ভদ্রগোছের সোফা, টিভি-ভিসিআর ও গান শোনার একটি যন্ত্র। রান্নাঘরের মতোই একটি রান্নাঘর, ফ্রিজসহ। তার পাশে ছোটো গোলাকার গ্লাসটপ খাওয়ার টেবিল। এই আমার সংসার।

এক কাপ কফি তৈরি করে নিয়ে পড়ার টেবিলে বসি। এতো রাতে কফি খাওয়া ঠিক হচ্ছে না জানি, ঘুমাতে কষ্ট হবে। তবু নিই, আজ এক্ষুণি বিছানায় যাবো না। আমার খাতাটি নিয়ে লিখতে বসি:

আমার দিনরাত্রি একাত্তর আর আমার দেশটির অনুষঙ্গে জড়ানো। আমার নিশ্বাসে, প্রতিদিনের অস্তিত্বে জেগে থাকে তারা। আমি বিশ্বাস করি বাঙালি জনগোষ্ঠীর শত শত বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবের, অর্জনের সময় ছিলো ওই বছরটি। এই জাতির এমন সংঘবদ্ধতা ও সম্মিলিত শৌর্য কেউ কোনোদিন দেখেনি, মানুষের জন্যে মানুষের ভালোবাসা ও মমতার অন্ত ছিলো না তখন – কার কি ধর্মবিশ্বাস তা জানার দরকার কারো হয়নি, তোমাকে চিনি না, তাতে কী, তোমার একবেলার খাদ্য প্রয়োজন, একটি রাত্রির আশ্রয় দরকার, বেশ তো এই আমার ঘর, উঠে এসো, ডালভাত যা আছে সবাই মিলে ভাগাভাগি করে খাবো, পর্যাপ্ত জায়গা নেই তো কী হলো, পালা করে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দেবো। মানুষগুলি যেন একেকটি নির্লোভ, অনাসক্ত সন্তের প্রতিমূর্তি। সে এক আশ্চর্য সময় ছিলো আমাদের! যারা দেখেনি, মানুষে-মানুষে এই ভ্রাতৃত্বের বোধ তাদের কল্পনায়ও সংকুলান হবে না। ভাবি, তেমন দিন কি আর কোনোদিন হবে!

জীবনের এই আশ্চর্য সময়টি আমার কমপিউটারে, ইমেল অ্যাকাউন্টের ইউজার আইডিতে, পাসওয়ার্ডে কোনো-না-কোনোভাবে যুদ্ধদিনের অনুষঙ্গ – ২৬ মার্চ অথবা ১৬ ডিসেম্বর আর আমার দেশ। এর নাম কি দেশপ্রেম? নাকি এক অনিবার্য নেশা বা মোহগ্রস্ততা? যে নামই দেওয়া হোক, এই তো আমি। এই উপলব্ধিতে আমি উপনীত হয়েছি, জীবনে যতোটুকু যা হয়েছি এবং যা-কিছু আমার হয়ে ওঠা হয়নি এবং আর কখনো হবে না – সবকিছুর মূলে থেকে গেলো সেই একটি যুদ্ধ। যুদ্ধ করতে হয়েছিলো বলে সতেরো বছরের রোমাঞ্চকর স্বপ্নিল অনুভবে সিঞ্চিত হওয়ার আগে শত্রুমিত্র চিনতে হলো, বাল্যকালের সঙ্গী সাইফুল, বাদশা, আলতাফ আলীকে শহীদের পরিচয়ে পরিচিত হতে হলো, গুলির ছররায় দুই চোখ অন্ধ হয়ে গেলো দুলালের, স্বাধীন দেশের সূর্যালোক তার কোনোদিন দেখা হলো না। যুদ্ধ হয়েছিলো বলে স্বাধীনতা এলো। আর স্বাধীনতার সঙ্গে ন্যায্য-অন্যায্য অনেককিছু আমাদের

হাতের মুঠোয় এসে পড়লো, অনভ্যস্ত হাতে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে সেগুলো আমরা হারিয়েও ফেললাম অচিরে।

এই শহরে বাংলাদেশ কমিউনিটির তিনটি সংগঠন, তারা কেন বিজয় দিবসে কোনো অনুষ্ঠান করে না? উত্তরটি অপ্রিয়, কিন্তু আমার অজানা নয়। আমাদের দেশপ্রেম বা দেশের জন্যে আনুগত্য বড়ো বেশি দলানুগত্যভিত্তিক – এখানেও আওয়ামী লীগ-বিএনপির বিভাজন। অনেকে শুনি এই দিনগুলিকে ভুলে থাকতে চায়, ভুলিয়ে দিতে পারলে বেঁচে যায়। এখনো এসব খোলাখুলি বলা হয় না, হয়তো অচিরে হবে।

আশ্চর্য সহনশীল দেশ আমার। স্বাধীনতার এতো বছর পরেও এমন সব মানুষ এ দেশে রাজনীতি করার অধিকার রাখে যারা বাংলাদেশ নামটিও মুখে আনে না। এতো সাধনার ধন এই স্বাধীন দেশটিকে এখনো তারা বলে পূর্ব বাংলা। সারা পৃথিবী আমার দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় স্বীকার করে নিয়েছে, এরা আজও মানেনি। একাত্তরে আমাদের যুদ্ধটি কি মুক্তিযুদ্ধ না জনযুদ্ধ না গৃহযুদ্ধ নাকি শুধুই দুই কুকুরের কামড়াকামড়ি তা এখনো স্থির করা হয়নি তাদের। তর্ক ও তত্ত্বের যুদ্ধ তাদের এখনো অমীমাংসিত, বিপ্লবের নামে নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি, খুনোখুনি চলে আজও। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ে আমার দেশের অভ্যুদয়ের বিপক্ষে সবচেয়ে বড়ো শক্তি যে জামাতে ইসলামী, তারা বাংলাদেশকে কোনোদিন স্বীকার করেনি, এ দেশটি তাদের কাছে এখনো পাকিস্তানের ছায়া-রাষ্ট্র। কৌশলগত কারণে বা আর যে কোনো কারণেই হোক, তারাও তাদের দলের নামের আগে বাংলাদেশ বসিয়ে দিয়েছে, অথচ আমাদের বিপ্লবীরা পারেনি। আমার দেশ এদের সবাইকে ধারণ ও সহ্য করে। ধর্মের বিপণনকারীরা বৈধভাবে রাজনীতি করার অধিকার পায়, তারা মাদ্রাসার নামে ধর্মসন্ত্রাসী ও ধর্মব্যবসায়ীদের উৎপাদন অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়। এমন মানুষের হত্যাকাণ্ডের বিচারও দাবি করা হয় বাংলাদেশের আইনের আওতায়, যে মানুষটি বাংলাদেশকে কোনোদিন বাংলাদেশ বলে মানেনি!

১৯৭২ সালে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনী ফিরে গেছে, আমাদের তখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিলো নিজেদের সংগঠিত থাকার, শত শত বছরের দীর্ঘ পরাধীনতার শেষে এই ভূখণ্ডের মানুষের সম্মিলিত শক্তির আরেকটি উৎসার। অথচ মাত্র কয়েকমাসের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম একটি বিশাল ও উন্মত্ত বিভাজন – মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া রাজনৈতিক দলটি বিভক্ত হয় রাতারাতি। পরবর্তী মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বিরোধীপক্ষের কথিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আন্দোলন পর্বতপ্রমাণ এক বিভ্রান্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। কিন্তু উপলব্ধিটি ঘটার আগেই হাজার হাজার তীক্ষ্ণধী ও মেধাবী যুবক এই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে প্রাণ দেয়, জীবিতদেরও অনেকের আর কোনোদিন স্বাভাবিক জীবনে ফেরা হয়নি। সেই বিপ্লবের স্বপ্নটি ব্যর্থতা ও ভুলের কালিমায় লিপ্ত হয়ে গেলে আমার বাল্যকালের বন্ধু টিপু বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায়। মিঠু এখন শুনেছি চায়ের দোকানে দিনমান বসে যে কোনো ইচ্ছুক শ্রোতাকে আসন্ন বিপ্লবের গল্প শোনায়

আজও, শ্রোতা কেউ না থাকলেও সে অবিরাম একই কথা একা একা বলে যায়। হয়তো তা-ও একপ্রকার ভালোই, সুস্থ মস্তিষ্কে থাকলে আজ তাদের হয়তো বিশ্বায়ন ও একক বিশ্বের জয়গান করতে হতো।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নেতৃস্থানীয়দের একজন বিপ্লবের পথ পরিত্যাজ্য বিবেচনা করে অবিলম্বে মাথায় টুপি ধারণ করে বাকি জীবন ধর্মীয় রাজনীতি করেন। আরেকজন, যিনি একাত্তরে মার্চ মাসের দুই তারিখে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের কলাভবনে সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকাটি উত্তোলন করেছিলেন, কালক্রমে বিশ্ববেহায়া নামে খ্যাত এক সামরিক শাসকের আয়োজিত জাতীয় সংসদে গৃহপালিত বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে খ্যাতি পান। স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করা সেই হাতটি উত্তোলিত করেন সামরিক একনায়কের সমর্থনে। আরেকজন, যিনি একাত্তরের মার্চে পল্টন ময়দানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেছিলেন, একাত্তরের রাজাকারের সহকর্মী হিসেবে আজ ক্ষমতাসীন মন্ত্রী এবং মেয়ের বিয়েতে কোটি টাকা ব্যয় করে কাগজের সংবাদ হন।

বিপ্লবের কাহিনী বলা তাদের বন্ধ হয়েছে সেই কবে, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনের অনেক বছর আগেই, স্বপ্নেও আর সমাজতন্ত্র বলে কিছু অবশিষ্ট নেই। একবার এই বিভ্রান্ত ও ভুল বিপ্লবের স্বপ্ন দেখানোর নেপথ্য নায়ক, যিনি বাংলাদেশের রাজনীতির কাপালিক নামে ব্যাপক পরিচিত এবং যিনি সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকাকে এখন বসবাসের যথাযোগ্য স্থান বিবেচনা করেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো। বগুড়ার টিপু এবং মিঠুকে তিনি স্মরণ করতে পারেন এবং তাদের উন্মাদ হয়ে যাওয়ার সংবাদ তাঁর হা হা হাসির উদ্রেক ঘটায়! যেন 'গঙ্গার রুচিকর হাওয়ায় নতুনদার ক্ষুধার উদ্রেক হইল।'

আজ কতো সুদূর মনে হয়, অথচ সেই মধ্য-ডিসেম্বরে আমাদের নিশ্চিহ্ন করতে আসা পাকিস্তানী শত্রুদের আমরা পরাজিত, নতমুখ করেছিলাম। নিরস্ত্র মানুষ মারার হাতিয়ারগুলো তারা নামিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিলো। আপনা থেকে তা হয়নি, আমরা লড়াই করেছি, আমাদের বীরত্বগাথা কিছু কম নয়। কারো কারো ভুল হয়ে যায় আজকাল, কেউ কেউ ইচ্ছে করে ভোলে। '...লোকে ভুলে যেতে চায়, সহজেই ভোলে...।' গৌরব ভুলে থাকা মানুষগুলোকে, যুদ্ধে আমাদের প্রতিপক্ষের সহযোগীদের বহু বছর ধরে আমাদের ক্ষমতাধররা তোষণ-পোষণ করে আসছে। আমাদের রাষ্ট্রের ক্ষমতাবানদের কারো কারো জীবনবৃত্তান্তে যুদ্ধের বছরটি অনুক্ত থাকে। তারা কেউ কেউ আজ যুদ্ধের বছরকে গণ্ডগোলের বছর বলে সুখলাভ করে। কীসের গণ্ডগোল? শরীরে রক্ত টগবগ করে ফোটে – এতো নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে শেয়াল-কুকুরের মতো মেরে ফেলা হলো, আমরা বীরের মতো লড়াই করে জয়ী হলাম – তার নাম গণ্ডগোল! এমন অপমান করার সাহসও ওদের হয়। আমরা আজ কী শক্তিহীন, চুপ করে থাকি!

মানবিক অনুভূতি অবশ্য মানুষেরই থাকে। অনেকদিন আগে একবার যুদ্ধে পরাজিত সৈনিকের অনুভূতি ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম। পরাজয়ের মুহূর্তে তাদের ঠিক কী মনে হয়? কেমন অনুভূতি হয় তখন? প্রাণে বেঁচে যাওয়া কি কোনো সান্ত্বনা? আচ্ছা, একাত্তরে ষোলোই ডিসেম্বরে আত্মসমর্পণের পর পাকিস্তানীরা দেশে ফিরে স্ত্রী-পুত্রকন্যাকে মুখ দেখিয়েছিলো কী করে? তাদের পরাজয়ের কী কৈফিয়ত ছিলো? পৃথিবীর সেরা সেনাবাহিনী বলে নিজেদের গণ্য করতো তারা, কী এমন হয়েছিলো যে মাথা নিচু করে তাদের ফিরতে হলো? গাজী বা শহীদ হওয়া নয়, আত্মসমর্পণের গ্লানি অনেক বড়ো।

কিছুতেই অনুমান করতে পারি না, আমার কল্পনাশক্তি সেই অনুভূতির বেড় পায় না। পাওয়ার কথা নয়, যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার অভিজ্ঞতাই যে আমাদের নেই! আমরা সেদিন পরাজয় জানিনি। অথচ আজ এতো বছর পরে ভাবি, আমরা কি সত্যি জিতেছিলাম? না, হেরে বসে আছি? এই প্রশ্ন আমার ভেতরে তুমুল শোরগোল তোলে। যে উত্তরটি প্রকাশ্য, তাকে মানতে পারি না। পারলে আমার এবং আমার মতো আরো অনেক মানুষের জীবনই যে ভুল হয়ে যায়, ব্যর্থ প্রতীয়মান হয়। আর লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগ? তার কি হবে? ইতিহাস বলছে, বিজয়ীরাই ইতিহাস রচনা করে। আমাদের সংগ্রামের, বীরত্বের ইতিহাস এখন কারা লিখছে, অথবা মুছে দিচ্ছে? অলিখিত ও উহ্য রাখছে?

Though I never thought that we could lose
There's no regret
If I had to do the same again
I would my friend, Fernando…

৬.

মুনির ভাই একাত্তরের এক দুপুরে ঢাকা শহরে জোনাকি সিনেমার পাশের একটি ব্যাংক অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ করতেও টাকার প্রয়োজন হয়। ঢাকা শহরে ঢুকে পড়া গেরিলাদের বাসস্থানের জন্যে ভাবতে হয়নি – নিজেদের বাড়িঘর ছিলোই – আরো অনেক ঘরের দরজা তাদের জন্যে উন্মুক্ত, আহার্যও সমস্যা নয়। কিন্তু তারপরেও টাকার দরকার যাতায়াত, যোগাযোগ, সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্যে। সুতরাং পাকিস্তানীদের ব্যাংক লুট করার সিদ্ধান্ত। এই ঘটনা ঢাকা শহরের মানুষকে সেদিন অনেক সাহস দিয়েছিলো, অপদস্থ বোধ করেছিলো দখলদাররা।

প্রকাশ্য দিবালোকে এই দুঃসাহসী অভিযানটিতে মুনির ভাইয়ের সঙ্গী আসাদ, রাজী, ফিরোজ আর ফেরদৌস। নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় অভিযান। স্বাধীনতার পর একশো মুক্তিযোদ্ধার বৃত্তান্ত নিয়ে একটি বই বেরিয়েছিলো, তাতে মুনির ভাই অন্তর্ভুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অগ্রবর্তী। পরিচয় ছিলো তখন, ঘনিষ্ঠতা হয়নি। বছর চারেক আগে তিনি এই শহরে কিছুদিন বসবাস করেছিলেন। একদিন আমার সঙ্গে যাচ্ছেন, তাঁর চুল কাটানো দরকার।

আজকের দিনটা আপনার মনে আছে, মুনির ভাই?

প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধাকে কিছু বিভ্রান্ত দেখায়। জিজ্ঞেস করেন, কেন, কী দিন আজ?

আজ ডিসেম্বরের ষোলো তারিখ। ক্যামনে ভুললেন?

চুপ করে থাকেন ভূতপূর্ব মুক্তিযোদ্ধা, বজ্রাহতের মতো স্থির। আমার, হয়তো তাঁরও, তখন স্মরণে আসে, তিরিশ বছর আগে এইরকম একটি দিনে চুল কাটানোর কথা আমাদের মনেও আসেনি। আমাদের তখন কাঁধ পর্যন্ত নামানো চুল, দীর্ঘদিন না-কামানো গালে দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে দুই চোখে ক্লান্তি, অথচ মুখে যুদ্ধজয়ের উল্লাসময় দীপ্তি। সেই উৎসবে শ্রান্তি তখন অবান্তর। হাতের অস্ত্রটি আকাশের দিকে তুলে ধরা, ভঙ্গিটি যেন এই কথা রাষ্ট্র করে দিতে চায়, আমরা অসাধ্য সাধন করেছি, আকাশও আর আজ আমাদের কাছে অজেয় ও সুদূর নয়। সেদিন আমাদের পোশাক মলিন ও অবিন্যস্ত, কাদামাটিতে মাখামাখি জুতা, কারো কারো খালি পা, নখ কাটা হয় না কতোদিন, অস্নাত এবং নির্ঘুম, শেষ আহার কখন হয়েছে মনেও নেই। বিজয়ীর যৌবন এইসব তুচ্ছ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার সময় পায় না, বরং তাকে অপ্রয়োজনীয় ও বাহুল্য জ্ঞান করে।

মুনির ভাই আমার দিকে তাকান না, সামনে সরাসরি রাস্তায় তাঁর চোখ নিবদ্ধ। কয়েক মুহূর্ত পরে তাঁর গালে অশ্রু গড়িয়ে নামতে দেখি। সারাপথ দু'জনে আর কোনো কথা বলি না।

পরে একদিন মুনির ভাই বলেছিলেন, আমার ক্যান জানি আর কিছুই মনে পড়ে না। ভুল হয়া যায়, আগরতলা যাওয়ার সময় এক রিকশাওয়ালা তার বাড়িতে একরাত আমারে লুকায়া রাখছিলো। তাদের একখান মোটে মুরগি, ডিম বেচলে ঘরে কিছু পয়সা আসে। আমি জানতে পারি নাই, তারা সেই মুরগি জবাই কইরা আমারে ভাত খাইতে দিছিলো। রিকশাওয়ালার বউ কয়, মুক্তিগো লাইগা কলিজাডা খুইলা দিতে পারি। আপনে চিন্তা কইরেন না ভাইজান, দ্যাশ স্বাধীন হইলে ম্যালা মুরগি হইবো আমার!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে যান মুনির ভাই। আমি বলি না, বলার মুখ নেই, ওই রিকশাওয়ালার ঘরে ম্যালা মুরগি হয়নি, আমরা জানি। স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমরা পারবো। সাম্যবাদী একটি রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা আমরা চেয়েছিলাম। সেখানে মানুষের ধর্মপরিচয় অপ্রাসঙ্গিক – ধর্ম হবে মানুষের ব্যক্তিগত চর্চার বিষয়, রাষ্ট্র ও ধর্ম পৃথক থাকবে, যেমন থাকে সকল আধুনিক ও সভ্য রাষ্ট্রে। রাষ্ট্রের পরিচালকরা সকল মানুষের কল্যাণ করবেন, মানুষকে নির্ভয়ে কথা বলার অধিকার দেবেন, আহার-পরিধেয়-আশ্রয়-বিদ্যচর্চা-স্বাস্থ্যের সংস্থান নিশ্চিত করবেন।

আমরা পারিনি, করা হয়নি কিছুই, আমরা দেশ ছেড়ে এসেছি। এমনও মনে হতে পারে, দেশই আমাদের ছেড়ে দিয়েছে। রাষ্ট্রের পালকরা আজ আর আমাদের ভাষায় কথা বলেন না, সে ভাষা তাঁরা বিস্মৃত হতে প্রবলভাবে ইচ্ছুক বলে মনে হয়।

দেশান্তরী, তবু দেশটি আমার বড়ো ভালোবাসার ধন। আমার দেশের সামান্যতম কোনো সাফল্যে আমার গর্ব হয়, চোখ আর্দ্র হয়। বিশ্বকাপ ক্রিকেটে নবাগত ও অখ্যাত বাংলাদেশ দুর্দান্ত পাকিস্তানীদের হারিয়ে দিয়েছে জেনে একলা ঘরে আমি প্রাণভরে কাঁদি। একুশে ফেব্রুয়ারিকে জাতিসঙ্ঘ সারা পৃথিবীর মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দিলে অহংকারে মাটিতে আমার পা পড়ে না।

৭.

সাল ১৯৭৪। আমার দেশটিতে পর পর অনেকগুলো ঘটনা ঘটে যায়। আজ এতোদিন পরে এসে মনে হয়, একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে কিছু বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা খুব অস্বাভাবিক বিষয় হয়তো নয়। সেইসব দিনে সশস্ত্র খুনখারাবি, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, ছিনতাই, ব্যাংক ডাকাতি, রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকলে ধারাবাহিক অগ্নিকাণ্ড এবং রাজনৈতিক নেতাদের লোলুপতা ও ভোগের কাহিনীর সঙ্গে আমরা সবেমাত্র পরিচিত হতে শুরু করেছি। তারপরেও আজকের বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনা করলে সেই সময়ের বিশৃঙ্খলাগুলোকে ছেলেখেলার মতো নিরীহ ও নিতান্ত অপেশাদার মনে হতে পারে। কিন্তু সে ছিলো সূত্রপাতের দিন।

বন্যায় তখন সারাদেশ ডুবে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি, বাড়ি যাবো, রাস্তাঘাটে পানি উঠে যাওয়ায় সড়কপথ বন্ধ। রেলপথটি কোনোমতে চালু আছে। এক সন্ধ্যায় কমলাপুর থেকে ট্রেনে উঠি। বাহাদুরাবাদ ঘাটে স্টীমার ধরে ওপারে ফুলছড়িঘাট। তারপর আবার ট্রেন। রেলপথেও কোথাও কোথাও বন্যার পানি উঠেছে। অনেক জায়গায় ট্রেন অতি ধীরে ও সাবধানে চলে। ভিড়ের ভেতরে কামরায় অনেকক্ষণ ধরেই এক ধরনের বোঁটকা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিলো। মনে হতে থাকে, চলে যাবে দুর্গন্ধটি, অথচ অনেকক্ষণ পরেও তা ট্রেনের কামরার ভেতরে আটকে ঘুরপাক খায়। ট্রেন স্বাভাবিক গতিতে চললে কম টের পাওয়া যায়, কিন্তু গতি কমলে দুর্গন্ধটি তীব্র হয়ে ওঠে। ক্রমশ বোঝা যায় আমি একা নই, ট্রেনের আর সব যাত্রীও সেই বিবমিষাময় দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ।

একটি ছোটো স্টেশনে ট্রেন থামলে সমস্ত যাত্রী প্ল্যাটফরমে নেমে আসে, হামলে পড়ে ট্রেনের গার্ডের কাছে। ড্রাইভার সামনে বসা বলে কোনো গন্ধ পায়নি, কিন্তু গার্ড নিজেও ভুক্তভোগী। সবাই একমত, এই দুর্গন্ধে টেকা সম্ভব নয়, মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়বে। কেউ কেউ দু'একবার বমিও করেছে বলে শোনা যায়। সবগুলো কামরা তোলপাড় করেও কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। দুর্গন্ধের উৎস শেষমেশ আবিস্কৃত হয় ট্রেনের ছাদে – যুবাবয়সী একজন মানুষের গলিত লাশ, বাঁশের চাটাইয়ে মুড়ে কেউ তুলে দিয়েছে। লাশের দাবিদার কেউ নেই। জানা কথা, থাকলেও স্বীকার করবে কে!

লাশটি ওই প্রায় অন্ধকার ছোটো স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে ট্রেন আবার চলতে শুরু করে। এতোক্ষণ তবু এক ট্রেন বোঝাই মানুষ লাশটির অনিচ্ছুক সহযাত্রী হয়ে ছিলো, এখন তা সত্যিকারের বেওয়ারিশ হয়ে পড়ে থাকে প্রায় অন্ধকার স্টেশনে। দাবিদার কেউ থাকলে সে-ও হয়তো ওই স্টেশনে নিঃশব্দে নেমে গিয়েছিলো। আমরা কেউ জানি না, কোনোদিন জানবো না।

বন্যার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এসেছিলো দুর্ভিক্ষ। হয়তো মনুষ্যসৃষ্ট, আমাদের রাষ্ট্রীয় পরনির্ভরশীলতার সুযোগে তা হয়তো ক্ষমতাধর প্রথম বিশ্বের দর্প প্রকাশের প্রমাণিত অমানবিক নিষ্ঠুরতা। তবু শেষ বিচারে তা একটি দুর্ভিক্ষই – অনাহারে-অপুষ্টিতে মানুষের মৃত্যু ও মহামারী, আর কিছু নয়। অসহায় ও নিরুপায় ক্রীড়নকের ভূমিকায় থাকে আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব।

একই বছরে এপ্রিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে এক গভীর রাতে গোলাগুলির শব্দ পাওয়া যায়। আমার রুমমেটরা ঘুমিয়ে, আমি একটি চিঠি লিখছি। হলের বাসিন্দা হিসেবে আমরা জানি হুড়মুড় ধাওয়া, ভাঙচুর, হৈ-হুল্লোড়, যখন-তখন গোলাগুলির শব্দ প্রায় প্রতিদিনের ব্যাপার, আমরা অভ্যস্ত হয়ে

উঠেছি। সরকার সমর্থক ছাত্রসংগঠনের আশীর্বাদে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা শাসন করা বাবা গ্রুপের ঘাঁটি এখানে, কোহিনূর নামের একজন তাদের দলনেতা। এই স্বঘোষিত বাবারা অনেক সময় নিজেদের মধ্যে মজা করার জন্যেও শূন্যে গুলি ছোঁড়ে। ক্যান্টিনে, ডাইনিং রুমে তারা আলাদা টেবিলে জামাই আদরে আহার করে, সামান্য এদিক-ওদিক কিছু ঘটলে থালাবাসন ভাঙাভাঙি, ম্যানেজারকে তখন কান ধরে উঠবস করতে হবে। তারা বরাবরই বড়ো সশব্দ, সুতরাং গভীর রাতের এই হৈ হুল্লোড়ে মনোযোগ না দিলেও চলে। আপনা থেকেই থেমে যাবে, আমরা এরকমই দেখে আসছি। কিন্তু আজ অন্যরকম হয়, সিঁড়িতে দীর্ঘ সময় ধরে অনেকগুলো পায়ের একসঙ্গে দ্রুত ওঠানামার শব্দ আসে, অস্পষ্ট চিৎকার ও ত্রস্ত গলায় কথা শোনা যায়।

কিছুক্ষণ পর নিস্তব্ধতা নেমে এলে ছয়তলা ছাত্রাবাসের সবগুলো কক্ষের বাসিন্দারা একে একে বেরিয়ে আসে। চাপা স্বরে এই সংবাদ প্রচারিত হয়ে যায় যে, কোহিনূর ও তার দলবলকে বন্দুকের মুখে তুলে নিয়ে গেছে আরেকটি সশস্ত্র দল। শুনে প্রত্যয় না হয়। কোহিনূরের দলবলকে তাদের নিজস্ব ঘাঁটি থেকে রাতদুপুরে তুলে নিয়ে যাওয়ার হিম্মৎ কার হবে! কয়েক মিনিট পরে ব্রাশফায়ারের আওয়াজ শুনি আমরা যে যার কক্ষ থেকে, বাইরে গিয়ে খোঁজ নেওয়ার কথা কারো কারো হয়তো মনে হয়, সাহসে কুলিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না।

পরদিন ভোরবেলা সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে যায়, মহসীন হলের টিভি রুমের সামনে কোহিনূরসহ সাতটি তাজা যুবকের রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। অবিলম্বে এ কথাও কারো অজানা থাকে না যে, এটি তাদের নিজেদের দলের অতি তুচ্ছ অভ্যন্তরীণ কোন্দলের রক্তাক্ত ফলাফল। আমরা পুনর্বার বুঝে যাই, রাষ্ট্রের ঘোষিত নীতি সমাজতন্ত্রের কর্মী এরা নয়, হবে না।

সেই বছরে একটি কবিতা রচনার দায়ে তরুণ কবি দাউদ হায়দারকে বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত হতে হয়। কবিতাটি ধর্মপ্রাণ মানুষকে আহত করে বলে জানানো হয়েছিলো। তখনো বাংলাদেশ শাসন করে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচারক একটি দল। যুদ্ধে পরাজিত ধর্মমুখী রাজনীতি নিষিদ্ধ এবং ধর্মের ধ্বজাধারীরা অসংগঠিত ও ছত্রখান। একটি দৈনিকের সাহিত্য সাময়িকীতে দাউদের কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিলো। বাংলাদেশে তখন সংবাদপত্রের পাঠকই বা কতো! সাহিত্য সাময়িকী বা কবিতার পাঠকও হাতেগোনা। তবু এই সীমিত প্রচারেও কবিতাটি কী প্রকারে ধর্মপ্রাণ মানুষকে আহত করেছিলো বা ধর্মোন্মাদদের সংগঠিত হতে সাহায্য করেছিলো, তার ব্যাখ্যা জানা যায় না।

নির্বাচনে অর্পিত যাবতীয় ক্ষমতা ও অনুকুল জনমত সত্ত্বেও সেই বাদ-প্রতিবাদ সামাল দেওয়ার মতো শক্তি বা সাহস তখনকার শাসকদের ছিলো না কেন, তা-ও এক পরম বিস্ময়। একজন কবির লেখার স্বাধীনতা শাসকরা সেদিন রক্ষা করতে সাহসী হয়নি। তারা ধর্মোন্মাদনাকে প্রশ্রয় দেয় এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দুই বছরের মধ্যে এক তরুণ কবির নির্বাসনের ঘটনায় পরোক্ষে পরাজিত, আত্মগোপনকারী ও অসংগঠিত মোল্লাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ঘটে যায়। রাষ্ট্র ও সংবিধান নির্ধারিত ধর্মনিরপেক্ষতার নৈতিক পরাজয়ের সেই শুরু।

একদিকে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচার, তার পাশাপাশি এই মোল্লা ও তাদের মধ্যপ্রাচ্যদেশীয় মহাজনদের তুষ্ট করার জন্যে লাহোরে ইসলামি সম্মেলনে শরিক হওয়া – এই বৈপরীত্য চলতে থাকে। সেই প্রশ্রয়ের বিষবৃক্ষ আজ মহীরূহে পরিণত। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উত্থানের বীজমন্ত্রের শত্রুতা শুধু নয়, সর্বশক্তি দিয়ে

সংগঠিত ইসলামপন্থীরা সেই উত্থানকে রুদ্ধ করতে চেয়েছে। কালক্রমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভাগীদার হওয়ার সামর্থ্যও তারা দেখিয়েছে।

আরো অদ্ভুত, যে লোকটির যুক্তিহীন একগুঁয়েমির কারণে এবং কূটচালের পরিণাম হিসেবে একাত্তরে পাকিস্তানী সেনারা নির্বিচারে বাঙালি হত্যা করেছিলো, সেই জুলফিকার আলী ভুট্টোকে জামাই আদরে বাংলাদেশে বরণ করা হলো। স্বাধীনতার দুই বছরের মধ্যে। পাকিস্তানে তখন লোকটি তার পরম সাধের প্রধানমন্ত্রিত্ব পেয়ে গেছে। ঢাকার রাস্তায় পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি শোনা যায়, তা-ও খুব গোপনে নয়। পরাজিতরা সংগঠিত হচ্ছে বলে কেউ কেউ সতর্ক করার চেষ্টা করেছিলেন, শাসকদের সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় ও ইচ্ছে ছিলো বলে ধারণা হয় না। একসময় যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানী সেনাদের বিচার করার কথা জোরেশোরে শোনা যাচ্ছিলো বাংলাদেশে, এখন তা চাপা দেওয়ার সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ্য হয়ে উঠতে থাকে। আর কী অবশিষ্ট আছে, প্রাণ দিয়েছি, মান দিয়েছি, আত্মসম্মানবোধ তা-ও দিয়েছি, আরো কী বিসর্জন দিতে হবে আমাদের?

তাজউদ্দিনকে পদত্যাগ করতে হলো অক্টোবরে। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তিনি, শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে প্রায় একা হাতে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনার দুরূহ কাজটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের যোগ্যতায় সম্পন্ন করেছিলেন। যুদ্ধের পরে শেখ মুজিব ফিরে এলে তাজউদ্দিন তাঁর কাছে গচ্ছিত আসনটি নেতাকে অর্পণ করে পেছনের সারিতে গিয়ে আসন নিয়েছিলেন। আমাদের জানতে বাকি থাকে না, তাঁকে কেন ও কাদের ইচ্ছায় রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব থেকে বিদায় নিতে হয়েছিলো – তিনি যে সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন!

আশ্চর্য হয়ে ভাবি, এইরকম একটি দুরন্ত অস্থির অসময়ে মুনিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী করে তৈরি হতে পেরেছিলো। মহসীন হলে সাত খুনের পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিঃশব্দ আতঙ্ক ও চাপা চাঞ্চল্য। তারই মধ্যে খুব নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে একা একটি মেয়েকে হাঁটতে দেখি। তার কোনো উদ্বেগ নেই, শঙ্কা নেই, যেন কোনো কিছুতেই কিছু এসে যায় না। একা সে হেঁটে আসে কলাভবন থেকে লাইব্রেরির দিকে। আমরা কয়েকজন লাইব্রেরির বারান্দায় বসা। আড্ডার মেজাজ নেই কারো, কিছু করার নেই বলে শুধু শুধু বসে থাকা। মেয়েটিকে আমরা চিনি না, কিন্তু আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় সে। খুব সহজ গলায় জিজ্ঞেস করে, আমি আপনাদের সঙ্গে বসতে পারি?

ভালো করে লক্ষ্য করে দেখি, হালকা নীল রঙের শাড়ি পরা মেয়েটিকে অপরূপ সুন্দরী বলা চলে না, কিন্তু চোখমুখে এক ধরনের অনায়াস সরলতা ও লাবণ্য আছে। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা তাকে আলাদা ব্যক্তিত্ব দিয়েছে। আমরা সাব্যস্ত করে নিই, মেয়েটির মাথায় গোলমাল না থেকে যায় না। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি মেয়ে যেচে ছেলেদের আড্ডায় বসতে চায়, এমন অভিজ্ঞতা তখনো আমাদের হয়নি।

আমাদের মধ্যে কেউ একজন কিছু অনিশ্চিত স্বরে বলে, নিশ্চয়ই।

এইভাবেই মুনিয়া এসেছিলো। নিয়তির মতো অমোঘ ও অনিবার্যভাবে। মেয়েটি কিছু পাগল-পাগল, সে বিষয়ে আমরা সবাই কমবেশি একমত। সে আমাদের আড্ডায় নিয়মিত আসতে শুরু করে। অবিলম্বে আড্ডার বাইরেও তার সঙ্গে একা আমার সাক্ষাৎ হতে থাকে। আশ্চর্য সেই সরল মেয়েটি যে পাগলের মতো ভালোবাসতেও জানে, কে জানতো!

৮.

এই রিকশা, রোখকে!

১৯৭৫-এর অগাস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এক দুপুরে গুলিস্তানের ফুলবাড়িয়া এলাকায় অকস্মাৎ এই নির্দেশ শুনে যুবক কিয়ৎক্ষণের জন্যে বিচলিত হয়। ঢাকা শহরে উর্দূ ভাষায় আজ এই নির্দেশ কোথা থেকে আসে! মধ্যবয়সী রিকশাওয়ালা রিকশা থামিয়েছে। আরোহী যুবক তাকিয়ে দেখে, সামরিক পোশাকে এক সশস্ত্র সৈনিক সামনে দাঁড়ানো। মুহূর্তের জন্যে বিভ্রান্তি আসে, কোনো জাদুর শক্তিতে কি সময় পিছিয়ে গেলো! সে কি একাত্তরের পাকিস্তানী সেনাকবলিত ঢাকা শহরে এখন! ভুল ভাঙতে সময় লাগে না – পাকিস্তানী নয়, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর একজন এই সৈনিক! শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হয়েছেন কয়েকদিন আগে, উর্দিধারীরা রাষ্ট্রের মালিকানা নিয়ে বসেছে। বাংলাদেশ বেতার এরই মধ্যে রেডিও বাংলাদেশ, একদা যেমন রেডিও পাকিস্তান বলা হতো। জয় বাংলা তুলে দিয়ে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ চালু হয়ে গেছে। বাঙালি সৈনিকরাও এখন উর্দু বলতে শুরু করলে অবাক হওয়ার কিছু থাকে না। উর্দির সঙ্গে উর্দুর সম্পর্ক অনেকদিনের, উর্দিধারীদের জন্যেই সম্রাট আকবরের আমলে উর্দু ভাষা তৈরি হয়েছিলো বলে জানা যায়।

তবু মাত্র কয়েক বছর আগে যুদ্ধের মাঠে থাকা যুবকের বিস্ময়ের ঘোর কাটে না। ভাবে, এসব কী ঘটছে? বেড়ে ওঠার বয়সে সে দীর্ঘকাল আইয়ুব খানের সামরিক শাসন প্রত্যক্ষ করেছে, ইয়াহিয়ার সৈনিকদের দেখেছে ধর্মরক্ষার নামে নিরীহ মানুষকে খুন করতে। একাত্তরের যুদ্ধ হয়েছিলো তো এসবেরই বিরুদ্ধে। তবু সামরিক শাসন এসে গেলো বাংলাদেশে। অস্বীকার করবে কে যে, শেখ মুজিব স্বাধীনতার সফল কারিগর হলেও শাসক হিসেবে ব্যর্থ হচ্ছিলেন ক্রমাগত, জনপ্রিয়তা ও সমর্থন দ্রুত হারাচ্ছিলেন! এরকম চললে তাঁকে সরে যেতেই হতো। প্রবল জনরোষের মুখে কবে কোন শাসক দীর্ঘদিন ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছে? একসময় তাদের বিদায় নিতেই হয়। কিন্তু রাতের অন্ধকারে সপরিবারে তাঁকে হত্যা করার কাপুরুষোচিত বর্বরতা মানা যায় কী করে?

শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত খোন্দকার মোশতাক সামরিক সরকারের প্রধান, মুজিব মন্ত্রিসভার বেশিরভাগই সামরিক সরকারের মন্ত্রী হিসেবে অধিষ্ঠিত তাঁর দাফন হওয়ারও আগে। তিনি নিহত হলেন, ঠিক পরদিন, স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছর পর, সৌদি আরবের সময় হয় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার, যেন তার আগে এই দেশটির অস্তিত্ব তারা জানতেও পারেনি। কাকতালীয় কি? আর এখন রাতারাতি বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তান বানিয়ে ফেলা হচ্ছে বলে যুবকের ধারণা হয়। সবকিছুই এতো দ্রুত ও অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে যাচ্ছে যে দুঃখিত বা বিস্মিত হওয়ারও সময় পাওয়া যাচ্ছে না।

রিকশাওয়ালা সৈনিকের সামনে রিকশা থামিয়ে নিজের সীটে বসে ছিলো। আরোহী যুবকের মতো তারও চোখে জিজ্ঞাসা, রাস্তার মাঝখানে থামতে বলা হলো কেন হঠাৎ? সৈনিকপুরুষ আচমকা তার পিতার বয়সী প্রৌঢ় রিকশাওয়ালার গালে সজোরে চড় বসিয়ে দেয়। রিকশাওয়ালা ঘুরে পড়ে যায় রাস্তায়। যুবক নিজের অজান্তে রিকশা থেকে নেমে এসে মুখোমুখি হয় সৈনিকের। চোখে চোখ ফেলে জিজ্ঞেস করে, অরে মারলেন ক্যান? কী দোষ করছিলো সে?

আপনে চুপ থাকেন তো মিয়া! নবাবের বাচ্চা রিকশা থামাইয়া সীটের উপরে বইসা থাকে!

বোঝা গেলো। প্রভুদের প্রতিনিধি সেপাইয়ের সামনে রিকশাওয়ালার সীটে বসে থাকাটা শক্ত ধরনের বেয়াদবি হয়েছিলো। যুবক এবার জিজ্ঞেস করে, কিন্তু থামতে বললেন ক্যান তা তো বুঝলাম না!

থামাইছি আপনের জন্যে। আপনের লম্বা চুলগুলি কাইটা ফেলতে হবে।

মানে?

ওঃ, আবার মানে জিগায়। আপনেরে তো বাংলায়ই বললাম, লম্বা চুলগুলি কাটতে হবে।

যুবক বোঝে, বিস্ময়ের আরো কিছু বাকি ছিলো। একাত্তরের পরে কিছুদিন কাঁধসমান লম্বা চুল রেখেছিলো সে, যতোদিন সশস্ত্র ছিলো। আনুষ্ঠানিক অস্ত্র সমর্পণের পরদিন চুলের দৈর্ঘ্য কমিয়ে ফেললেও মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল রাখে সে এখনো। একেবারে ছোটো ছোটো করে কদমছাঁট দেওয়া তার কোনোকালে পছন্দ ছিলো না। মুনিয়ার আগ্রহ ও উস্কানিতে কিছুদিন ধরে তাকে আবার কাঁধসমান লম্বা চুল রাখতে হচ্ছে। মুনিয়া বলে, লম্বা চুলে তোমাকে কী সুন্দর দেখায়!

নিজেকে সুন্দর লাগুক, কোন মানুষ তা না চায়? প্রেমিকার চোখে সুন্দর হওয়ার আলাদা মূল্য তো আছেই। কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা চুলগুলি তার ব্যক্তিত্বের অংশ, যেমন তার চোখ, মুখমণ্ডল, পোশাক, তার হাঁটাচলা এবং বাকভঙ্গি। এইসব মিলিয়ে সে অন্য সবার চেয়ে আলাদা একজন কেউ। সৈনিকদের সে সুযোগ অবশ্য নেই – কদমছাঁট চুল তাদের সবার, প্রত্যেককে একই ইউনিফর্ম ও বুট পরতে হয়, একই ছাঁচে তাদের হাঁটা বা ছোটা, বিশেষ ভঙ্গি ও স্বরে তাদের কথা বলা – সম্মিলিতভাবে তারা একটি একক ব্যক্তিত্বের ছবি। অন্যদের থেকে একটু আলাদা হতে গেলেই শৃঙ্খলাভঙ্গ, শাস্তির ভয়।

সামরিক শাসকরা ও তাদের বাধ্য-অনুগত সৈনিকরা ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতীকগুলোকে অনুমোদন দিতে প্রস্তুত নয়। প্রত্যেকটি মানুষকে এক ছাঁচে, নিজেদের সম্মিলিত একক ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ হিসেবে দেখতে ইচ্ছুক তারা। ব্লাডি সিভিলিয়ানদের তারা নিচু জাতের প্রাণী, যেন মনুষ্যপদবাচ্য নয়, বলে মনে করে এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ হাতছাড়া করতে তারা অনীহ। ভাবটি এমন, তোমার চুল কতোটা লম্বা হতে পারবে তা-ও আমরা নির্দিষ্ট করে দেবো। তোমার ওপর আমাদের সর্বময় কর্তৃত্ব, আমরা তোমার আহার-বিহারসহ সবকিছুর মালিক। মনে থাকে যেন, তুমি আমাদের আজ্ঞাবহ মাত্র।

যুবক প্রতিবাদ জানানোর চেষ্টা করে, আমার চুলে কী দোষ করলো? আমি আমার নিজের মতন থাকি, কারো সাতে-পাঁচে নাই।

তীক্ষ্ণ স্বরে সৈনিক বলে, ওইসব কিছু বুঝি না, ওইদিকে গিয়া বাবরিডা কাইটা নিয়া তারপর যেখানে যাইতেছিলেন যান। বেশি প্যাচাল পাড়লে খবর আছে।

সৈনিকের নির্দেশ করা আঙুল অনুসরণ করে যুবক দেখতে পায়, রাস্তার পাশে একটি দেয়াল ঘেঁষে সারি দিয়ে অনেকগুলো উঁচু কাঠের টুল বসানো। প্রত্যেকটির ওপরে মাথা নিচু করা একেকজন মানুষ বসা এবং পাশে দাঁড়িয়ে ক্ষৌরকাররা মানুষগুলোর চুল ছাঁটে একাগ্রমনে। টুলে বসা মানুষগুলোর মুখভঙ্গি এখান থেকে বোঝা যায় না, বুকের কাছে মাথা নামিয়ে রাখাও একটি কারণ বটে, কিন্তু যুবক জানে, বাধ্য হয়ে এইভাবে অন্যের কাছে নিজের মাথাটি জমা দেওয়ার অপমান তাদের সবার চোখেমুখে লেগে আছে।

শেষ চেষ্টা হিসেবে যুবক জানায়, সে একটি জরুরি কাজে যাচ্ছে, দেরিও হয়ে গেছে। তা সম্পন্ন করে চুল ছাঁটানোর কাজটি সে নিজেই সেরে নেবে।

আচমকা আরেক সৈনিকপুরুষ, একজন অফিসার, আবির্ভূত হয়। রাস্তার একপাশে অপেক্ষমাণ সাঁজোয়া গাড়ির ভেতরে সম্ভবত এতোক্ষণ বসে ছিলো। কর্কশ স্বরে সে জিজ্ঞাসা করে, প্রবলেমটা কি?

অধঃস্তন সৈনিকটি জানায় যে, বড়োই বেয়াড়া এই যুবক।

অফিসার শ্রেণীর সৈনিকপুরুষের মুখ থেকে একটিমাত্র শব্দ – তা স্বর্গনিসৃত কোনো শব্দ বলে ভ্রম হয় না – নির্গত হয়, বাঞ্চোৎ!

এই মোক্ষম শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সে যুবকের মাথাভরা ঝাঁকড়া চুল মুঠো করে ধরে টেনে নিয়ে যায় রাস্তার পাশে। ধাক্কা দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেয় দেয়াল ঘেঁষে চুল ছাঁটানোর জায়গাটির দিকে। অপ্রস্তুত ছিলো যুবক এই চকিত আক্রমণের জন্যে, কোনোমতে রাস্তার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়া থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু অপমানবোধে চোখমুখ জ্বালা করে ওঠা থেকে নিজেকে কীভাবে রক্ষা করবে সে জানে না। তার কান-মাথা-মুখমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তা শুধুমাত্র এই সূর্যতপ্ত দুপুরের তীব্র উত্তাপের কারণে নয়। দুই চোখ তীব্র ঘৃণার আগুনে জ্বলতে থাকে, হাত নিশপিশ করে, কিছু একটা তাকে করতে হবে, কিন্তু কী করা যেতে পারে তা সে ভেবে স্থির করতে পারে না। রাষ্ট্রশক্তির সশস্ত্র প্রতিনিধির সামনে তার কিছুই করার ক্ষমতা নেই, এই বোধ তাকে আরো ক্রুদ্ধ করে। শিকারীর জালে আটকা পড়া বাঘের তবু গর্জন ও আস্ফালন করার ক্ষমতা থাকে, যুবকের তা-ও নেই। এই অসহায়ত্বের অনিবার্য অনুভব ক্রমশ বিস্তারলাভ করলে ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে নিরুপায় হতাশাবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়।

৯.

পরের তিনটি দিন কাটে গুহাবাসী সন্ন্যাসীদের মতো নিজের কক্ষে আবদ্ধ থেকে। এই সময়টি আমার নিজের সঙ্গে থাকার দরকার ছিলো। মুণ্ডিত মাথা একটি কারণ বটে, এভাবে আমাকে দেখতে কেউ অভ্যস্ত নয়, এমনকি আমি নিজেও না। প্রকৃতপক্ষে এই অযাচিত অপমান আমার প্রাপ্য ছিলো না, নিষ্ফল ক্রোধ এবং তার প্রতিক্রিয়ায় হতাশার বোধও ইপ্সিত ছিলো না। এইসব অদৃশ্য ক্ষতের পরিচর্যা ও উপশমের জন্যে সময়ের প্রয়োজন হয়। আমার ইতিকর্তব্য স্থির করাও জরুরি তখন।

দুই সীটের কক্ষটিতে রুমমেটের অনুপস্থিতি আমাকে কিছু অস্বস্তি থেকে রক্ষা করে। আমার রুমমেট যশোরের গোলাম মোস্তফা ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের নেতা। শেখ মুজিব নিহত হওয়ার খবর পেয়ে সে নিরাপদ আশ্রয়ে আত্মগোপন করা জরুরি বিবেচনা করে গ্রামের বাড়ি চলে গেছে। জানিয়ে গেছে, কোনোরকম প্রতিরোধ সংগঠিত হওয়ার সংবাদ পেলে সে ফিরে আসবে।

মোস্তফা এবং আমি দু'জনেই এখন আত্মগোপনকারী – দুটি সম্পূর্ণ পৃথক কারণে। সে রাজনীতিসংশ্লিষ্ট এবং তার সমর্থিত দলটি অতর্কিতে ও অপ্রত্যাশিত উপায়ে ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়েছে, তাদের প্রধান নেতা নিহত, অন্য নেতাদের কেউ সামরিক শাসকের মন্ত্রী অথবা পলাতক কিংবা কারাগারে এবং সংগঠনটি ছত্রখান। আপাতত নিরাপদ কোথাও আশ্রয় নেওয়া তার জন্যে যুক্তিসঙ্গত।

রাজনীতিতে আমার প্রকাশ্য ও সক্রিয় কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। সাম্যবাদী একটি রাষ্ট্র আমাদের যুদ্ধের একটি লক্ষ্য ছিলো। শেখ মুজিব বা তাঁর দল তা অর্জন করতে সক্ষম হবে, এমন ভরসা কেউ হয়তো করেনি। তবু স্বীকার করতেই হবে, তিনি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ঘোষিত হয়েছিলো, সংবিধানে তার স্বীকৃতি ছিলো। সমাজ পরিবর্তনের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা বামপন্থী শক্তিগুলোর। অথচ উপযুক্তভাবে সংগঠিত বামশক্তির সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাদের কেউ অতি আপসকামী, বাকিরা অপ্রয়োজনে শক্তিক্ষয় করে – জনমানুষকে সংগঠিত না করেই বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে এবং দুর্বোধ্য ও অনুবাদসাপেক্ষ বাংলা ভাষায় তত্ত্ব প্রচার করে। ফলে, রাজনীতিমনস্ক হয়েও আমার তাতে শরিক হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

তবু আমাকে আক্রান্ত ও অপমানিত হতে হয় প্রকাশ্য দিবালোকে, উন্মুক্ত রাজপথে শত শত মানুষ তা চাক্ষুষ করেছে। জানি, প্রত্যক্ষদর্শীদের কেউ আমার নাম-পরিচয় জানে না, কোনোকালে তাদের কারো সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ ঘটলে আমি তাদের চিনবো না, তারাও কেউ আমাকে হয়তো শনাক্ত করতে পারবে না। অথচ এই উপলব্ধিও আমার প্রকাশ্য অপমান ও অবনমনের উপশম বা সান্ত্বনার কারণ হয় না। আমি নিজে এই ক্ষত এবং তার যাবতীয় অনুষঙ্গ উপেক্ষা করি কী করে? আমার মস্তকমুণ্ডন পর্বটি বড়ো বেশি অপমানসূচক হয়েছিলো। মাথার ভেতরে সেই দৃশ্যটি পুনঃ পুনঃ অভিনীত হতে থাকে এবং একসময় আমার চরিত্রটিকে আর আমার নিজের বলে মানতে পারি না। মনে হয়, আমি নই, ওই যুবক অন্য কেউ! এই উপলব্ধিও আমার ঘটে যে রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবর্তনের আঁচড় সবার গায়েই কমবেশি লাগে। তখন রাষ্ট্রের সীমানায় নিরাপদ কোনো দূরত্ব নেই।

সেদিন সেই দুপুরে প্রবল বিবমিষা, নিষ্ফল ক্রোধ ও হতাশায় বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তার পাশে। প্রৌঢ় রিকশাওয়ালা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে আমার কাছে। ফিস ফিস করে অস্পষ্ট গলায় বলে, অগো লগে বিবাদ কইরা কী করবেন? শ্যাখ সাবের মতন মানুষরে মারছে, অরা মানুষের পয়দা না।

সম্বিত ফেরে। সামান্য কথায় বৃদ্ধ ভয়াবহ একটি সত্যের মুখোমুখি করে দেয় আমাকে। এই বাংলাদেশে শেখ মুজিবকে গুলি করে খুন করা সম্ভব হলে আর কেউ কি নিরাপদ?

ভাড়া দিয়ে বিদায় করতে উদ্যত হলে রিকশাওয়ালা বলে, আপনে চুল কাইটা আসেন, আমি আপনেরে জায়গামতো নামাইয়া দিয়া যামু।

চুল কেমন কাটা হয়েছিলো, দেখিনি। যন্ত্রচালিতের মতো গিয়ে টুলে গিয়ে বসি, একটিও কথা না বলে নিজের মাথাটি জমা দিই, একবারের জন্যেও মুখ তুলি না। আমার অবনত মুখ অপমানের অশ্রুতে ভিজে যাচ্ছিলো। বাধ্যতামূলক চুল কাটানো শেষ হলে নিজের আপাত-অক্ষত অথচ প্রবলভাবে ক্ষতবিক্ষত মস্তকটি ফেরত পেয়ে রিকশায় উঠি। রিকশাওয়ালাকে সূর্যসেনের বদলে জহুরুল হক হলে যেতে বলি। সারা পথ সে অনেক কথা বলে যায়, আমি তার কিছুই শুনি না। নিউ মার্কেটে পরিচিত সেলুনে যাই না, সূর্যসেন হলের চেনা ক্ষৌরকারকে এখনকার চেহারা দেখানোর বাসনা নেই, হলে ঢুকতেও চেনা মুখের সাক্ষাৎ মিলে যাওয়ার আশংকা।

জহুরুল হক হল থেকে মুণ্ডিত মস্তকে বেরিয়ে আসি। বোধবুদ্ধি হওয়ার পর এই প্রথম আমি ন্যাড়া হলাম। আসলে রাষ্ট্রশক্তি আমাকে বাধ্য করে। হায়, আমাদের শাসকদের বুঝি করার মতো আর কোনো কাজ অবশিষ্ট নেই, কার মাথায় কতো বড়ো চুল তা নিয়ে তাদের এখন বেশি মাথা ঘামাতে হয়! এই মাথাগুলিকে বশে আনতে না পারলে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে! মনে পড়ে যায়, ৭৪ সালে সর্বশক্তিধারী রক্ষীবাহিনী আবির্ভূত হলে আমাদের ছোটো শহরে তাদের লক্ষ্য করে বিদ্রুপের স্বরে বলা হতো, মাথা রে! কে এবং কেন এই শব্দ দুটি চয়ন করেছিলো জানা যায় না, কিন্তু উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হয়েছিলো – মাথা রে! শুনলেই জলপাই রঙের পোশাকধারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাড়া করে আসতো, তাদের হাতে পড়ে দু'চারজন কিছু মারও খেয়েছিলো মনে আছে।

আমি কাউকে উত্যক্ত করে কিছু বলিনি, রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তন বিষয়ে আমার মতামত কিছু নিশ্চয়ই আছে, তা আমি নিজের কাছে গচ্ছিত রেখেছি। কারণ নিকট ইতিহাস জানাচ্ছে, সামরিক শাসন কোনো বিরুদ্ধমত সহ্য করে না, তাই বিস্ময়ে ও ঘটনাবলির আকস্মিকতায় ভয়ানক অনিশ্চিত বোধ করলেও মুখ বন্ধ রাখতে শিখে গিয়েছি। ক্রমাগত সামরিক শাসনের জগদ্দল থেকে উদ্ধার পাওয়ার আকুতি আমাদের ছিলো, প্রাণ ভরে শ্বাস নেওয়ার মতো একটি মুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রাণপণ বাসনা আমাদের যুদ্ধের একটি শর্ত ছিলো। কী ফল হলো? আমার নিরীহ-নির্বিরোধ চুল পর্যন্ত এখন রাষ্ট্রের এখতিয়ারে এবং তা-ও বলপূর্বক আমাকে গলাধঃকরণ করানো হচ্ছে, আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা সেখানে অবান্তর। মুক্তিযুদ্ধ করে ফেরা একুশ বছরের যুবকের কাছে তা শ্বাসরোধের শামিল।

অফিসার শ্রেণীর সৈনিকপুরুষের উচ্চারিত সেই বাঞ্চোৎ শব্দটি আমার মাথায় বিপুল অগ্নিকাণ্ডের উত্তাপ ছড়ায়। অন্ধ ক্রোধে চারপাশের সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে ফেলতে ইচ্ছে করে। ঘরবন্দী ওই সময়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস হাতের কাছে পেয়ে পড়ে ফেলি – *ঘুণপোকা*। উপন্যাসের নায়ক শ্যাম একটি ভালো চাকরি অনায়াসে ছেড়ে দিয়ে অনিশ্চিত জীবনের দিকে যায়, উর্দ্ধতন একজন শ্যামকে

বাস্টার্ড বলেছিলো বলে। বাস্টার্ড ও বাঞ্চোৎ – দুটি শব্দই প্রবল অসঙ্গত ও অনৈতিক যৌনতার ইঙ্গিতবাহী। শ্যামের ক্ষেত্রে শব্দটি খানিকটা পরোক্ষ এবং তাকে সেই ক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে সম্বোধন করা হচ্ছে, সেখানে তার কোনো অংশগ্রহণ নেই। কিন্তু আমার বেলায় তা অতি প্রত্যক্ষ, অসহনীয়ভাবে অপমানসূচক ও কৃতকর্মের অভিযোগসম্বলিত।

বইটি আমাকে অপ্রত্যাশিত ও আশ্চর্য এক প্রশান্তি দেয়, সন্ন্যাসীর উদাসীনতায় চারপাশকে দেখতে সাহায্য করে। বস্তুত, আমার কর্তব্যকর্ম নির্ধারিত করে দিয়েছিলো এই ক্ষীণকায় বইটি – আমি দেশত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। বড়ো বেদনায় আমাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই দেশটির জন্যে আমি যুদ্ধ করেছি, জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলাম, যুদ্ধশেষে দেশের মঙ্গল ছাড়া আর কিছু চাইনি। তবু এ দেশে আমার জায়গা হবে না!

আমার গুহাবাসী হয়ে থাকার কালে মুনিয়া নিয়মিত জায়গাগুলোতে সন্ধান না পেয়ে হলে আসে। ওয়েটিং রুম থেকে চিরকুট পাঠায়। চিরকুটের বাহককে বলে দিই জানিয়ে দিতে যে, আমার রুমে তালা দেওয়া। এই সময়ে আমি সিগারেটে আসক্ত হই। আগে দু'একবার টান দিয়েছি, ভালো লাগেনি। বৃদ্ধ সুরুজ মিয়া তখন আমার অভিভাবকের মতো। সুরুজ মিয়া হলের চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী, নিয়মিত কাজের পাশাপাশি ছাত্রদের ফাই-ফরমাশ খেটে কিছু বাড়তি উপার্জন করে। আমার ময়লা কাপড়-চোপড়, বিছানার চাদর নিজের উদ্যোগে নিয়ে যায় লন্ড্রি করতে, সময়মতো নিয়েও আসে, দরকারমতো ডাইনিং রুম থেকে বা বাইরের কোথাও থেকে টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার নিয়ে আসে। আমার ন্যাড়া মাথা দেখে বলে, আপনেরে এই চুল ফালানোর ভূতে পাইলো ক্যান? ভালো দ্যাহায় না মোডে।

সুরুজ মিয়াকে দুপুরের ভাত আনার সময় পাঁচটি ক্যাপস্টান সিগারেট কিনে আনতে বললে সে চোখ কপালে তুলে বলে, ওইসব আপনে খান না, আর খাইতে হইবো না। ঘর থিকাও দেহি বাইর হন না। কী হইছে আপনের?

খুব ঠাণ্ডা গলায় বলি, কিছু হয় নাই, সুরুজ মিয়া। যা কই, তাই শোনেন। সিগারেট আইনেন।

সুরুজ মিয়া কী বোঝে সে-ই জানে, হয়তো অসন্তোষ জানানোর জন্যেই, পাঁচটা নয়, দেশলাইসহ পুরো এক প্যাকেট ক্যাপস্টান এনে রাখে আমার টেবিলে।

তিনদিন পরে ঘর থেকে বেরোলেও বাইরে কোথাও যাই না, হলের চত্বরে একা একা বসে থাকি। কতো কী যে সব উল্টোপাল্টা ভাবনা ভাবি। রাত বেশি হলে রেজিস্ট্রার বিল্ডিং-এর সামনের জনহীন কংক্রিটের রাস্তার ওপরে বসে থাকি, সিগারেট জ্বলে আঙুলের ফাঁকে।

মুনিয়াকে দেখা দিই প্রায় মাসখানেক পরে, ততোদিনে মাথায় চুল কিছু হয়েছে। এখনো চিরুনি না হলেও চলে অবস্থা। মুনিয়া হয়তো তা লক্ষ্য করে না, করলেও উল্লেখ করে না। তার উদ্বেগের জায়গা আলাদা, কী হয়েছিলো তোমার, কোথায় ছিলে?

প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলি, আমি বিদেশে চলে যাচ্ছি।

দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেও তখনো জানি না কোথায় কবে এবং কীভাবে যাচ্ছি। দেশের বাইরে বসবাস করতে যাবো, কোনোদিন ভাবিইনি। তার সুলুক-সন্ধান কিছু জানা নেই। জানতে হবে।

মুনিয়া জিজ্ঞেস করে, হঠাৎ কী হলো?

এমনি, কারণ ছাড়াই। ভালো লাগে না কিছু। থাকলাম তো এই দেশে অনেকদিন, এখন একটু বাইরের পৃথিবী দেখি।

মুনিয়া কী বোঝে কে জানে, চুপ করে যায় সে।

দিন যায়। উদাসীন সব দিন। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে আলগাভাবে কিছু খোঁজখবর করি, দেশের বাইরে কোথায় যাবো, যেতে হলে কী করতে হবে। তারাই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দেয়, আমেরিকা চলে যা।

আমেরিকা নিয়ে আর অনেকের মতো আমার কোনো বিশেষ অনুরাগ বা আকর্ষণ নেই। যুদ্ধের সময় তারা আমাদের সরাসরি বিরোধিতা করেছে। ততোদিনে আবার কানাঘুষা শুরু হয়েছে যে শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডে আমেরিকার হাত ছিলো। বহু বছর ধরে তারা অনেক দেশে এই কাণ্ড করেছে। তাতে কিছু বিরাগ জন্মাতেই পারে, কিন্তু নিজের ইচ্ছেমতো জীবন যাপন করার জন্যে আমেরিকা সবচেয়ে উপযুক্ত দেশ বলে বন্ধুরা প্রবলভাবে একমত। আমার তখন কিছুতেই কিছু এসে যায় না। আমেরিকা না হয়ে সাইবেরিয়া হলেও আমার আপত্তি ছিলো না।

রাতের পর রাত কারফিউ-এ দমবন্ধ অবস্থা, সেই মধ্য-অগাস্টে শুরু হয়েছে, তা আর কোনোদিন উঠে যাবে বলে মনেও হচ্ছে না। একুশ বছর বয়সী এই আমার মধ্যরাতের পরও বাইরে থাকার ইচ্ছে ও প্রয়োজন থাকতেই পারে। তা যদি না-ও থাকে, তবু ইচ্ছে হলেও কারফিউ-এর বেড়া আমাকে ঘর থেকে বাইরে যেতে দেবে না – ভাবলেও দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে।

রাজনীতি বলে প্রকাশ্যে কিছু নেই, থাকলেও তার সন্ধান আমার জানা নেই, শাসকদের বিরোধী রাজনীতিকরা আত্মগোপনে অথবা জেলখানায়। কোথাও কোনো ভরসার আলো দৃশ্যমান নয়। মাঝে মধ্যেই পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থানের গুজব শোনা যায়। নভেম্বরের শুরুতে সত্যি সত্যি তা ঘটেও – তিন-চার দিনের ব্যবধানে দুটি, যে সময় দেশটির চালক কারা তা-ও কারো জানার উপায় ছিলো না। গুজবের ডালপালা ছড়ায়। একসময় জয়ী এবং পরাজিত পক্ষের পরিচয় জানা যায় – প্রাথমিক জয় খালেদ মোশাররফের, তারপর কর্নেল তাহেরের সহযোগিতায় জিয়া জয়ী, ফলে খালেদ মোশাররফ পরাজিত ও নিহত। পুরাণকাহিনীতে বর্ণিত ভ্রাতৃসংহারের নতুন রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি।

এই গোলযোগের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় চার রাজনীতিককে জেলখানায় খুন করা হয়। শেখ মুজিবের হত্যাকারী বলে যারা নিজেদের বীর ঘোষণা করেছিলো, তাদের নিরাপদে দেশের বাইরে পাচার করে দেওয়া হয়। ষড়যন্ত্র, অভ্যুত্থান, গুজব, আতংক, উপর্যুপরি হত্যাকাণ্ড – এইসব উপাদান সহযোগে মানুষের জন্যে যা প্রস্তুত হয় তা এক ধরনের ক্লান্তি, নিরাসক্তি ও হতাশা।

এর শেষ কোথায়, কেউ জানে না। অনিশ্চয়তা ঘনীভূত হয়ে ওঠে। ক্রমশই প্রতীয়মান হতে থাকে, এ দেশটি চলবে গায়ের জোরে। বন্দুকধারীরা সহজে হটবে না। হত্যাকারীরা পুরস্কৃত হবে। কারাগারের নিরাপত্তার মধ্যেও কোনো নিরাপত্তা আসলে রাখা হবে না। ধিক্কার জন্মায় – এই দেশ আমার নয়, এই ব্যবস্থার জন্যে আমি যুদ্ধ করিনি।

আমার সিদ্ধান্ত তখন আরো সহজ হয়ে যায়। নভেম্বরে এইসব ঘটনার আগেই আমেরিকার ভিসা হয়ে গিয়েছিলো, ডিসেম্বরে আমার দেশ ছেড়ে আসা। পারিবারিক পিছুটান সবার মতো আমারও কিছু ছিলো, তবু কেউ কোনো আপত্তি জানায়নি।

এক মুনিয়াকে নিয়ে কিছু সংশয় ছিলো, সে কীভাবে নেবে। এই সময়ে আমার চলে যাওয়ার অর্থ তার সঙ্গে চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ, তা আমার জানা ছিলো। মুনিয়াও জানতো, তবু সে খুব সহজভাবে বিদায় দিয়েছিলো। তাকে সব কথা খুলে বলা হয়নি, আমার আত্মসম্মানবোধ তা অনুমোদন করেনি। এ আমার এমনই ব্যক্তিগত অপমান, ব্যর্থতা ও পরাজয়, সে কথা প্রেমিকাকেও বলা সম্ভব হয় না।

মুনিয়া কী বোঝে, সে-ই জানে। বলেছিলো, তোমার ওপর আমার এইটুকু বিশ্বাস আছে যে, গভীর কোনো কারণ না থাকলে তুমি আমাদের সম্পর্ককে উপেক্ষা করে এরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারতে না। আমাকে কিছু ব্যাখ্যা করে বলার দরকার নেই। তোমাকে ভালোবাসি বলে স্বার্থপরের মতো তোমার পথ আগলে ধরবো কেন? বরং ওই ভালোবাসার অধিকারেই আমি তোমাকে একটি প্রশ্নও করবো না।

বিদায়কালে এয়ারপোর্টে আমার হাতে একটি খাম গুঁজে দেয় মুনিয়া। বলে, এখন পড়ার দরকার নেই, পরে পড়ে নিও।

আসলে বিদায় জানাতে আসা সবার চোখের সামনে তা সম্ভবও ছিলো না। বিমান আকাশে উড্ডীন হলে খামটি খুলি। একটি ছোটো চিরকুট। মুনিয়া লিখেছে, কোনোদিন আমাদের দেখা আর হবে কিনা, জানি না। তবু যতোদূরেই যাও, আমি তোমার খুব কাছাকাছি আছি জেনো। বিচ্ছেদেই তুমি আমার চিরদিনের হয়ে গেলে।

বিমান ক্রমশ উঁচুতে ওঠে। মনে হয়, এই উচ্চতা ও ব্যবধান থেকে আমার দেশটিকে কোনোদিন দেখা হয়নি। আমার জন্মভূমির বৃক্ষলতা, মানুষের বসতি, জলাশয় আর ওপরে নীল আকাশ – সব ছেড়ে এখন আমার অনিশ্চিত যাত্রা। যুদ্ধের দিনে কখনো স্বপ্নেও কি ভেবেছি, এই দেশটি ত্যাগ করে আমাকে চলে যেতে হবে?

একসময় চারপাশে শুধু সাদা মেঘের ওড়াউড়ি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না, মনে হয় মাটির পৃথিবীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগই আর নেই। টের পাই, প্রতি মিনিটে এখন আমার আর মুনিয়ার মধ্যে যোজন যোজন শূন্যতার দূরত্ব রচিত হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ দূর, আরো দূর। এখনো বিমান আমার দেশের সীমানায়, কিছুক্ষণ পরে চলে যাবো অন্য কোনো সীমানায়। হঠাৎ মনে হয়, আমি হয়তো ভুল করে এই বিমানে উঠে বসেছি। আমার কোথাও যাওয়ার কথা ছিলো না।

এখন ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয়, মুনিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তটি কী সহজে নিয়েছিলাম। জীবনে প্রথমবারের মতো একটি প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছি, আভাসে-ইঙ্গিতে ভবিষ্যতের কথাও উল্লিখিত হতে শুরু করেছিলো, দু'জনেই হয়তো সম্পূর্ণ নিমজ্জনের জন্যে তৈরিও ছিলাম। সেই ভালোবাসার জনকে ছেড়ে দিতে কষ্ট হওয়ার কথা। হয়নি তা নয়, কিন্তু তা অনেক পরে, যখন আর ফিরে যাওয়া নেই। ততোদিনে মুনিয়াকে আমি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছি। আবার ভাবি, সেই সময়ে হয়তো আমি স্বাভাবিক মানুষ ছিলাম না। কেউ কি ছিলো সেদিনের বাংলাদেশে? থাকা সম্ভব ছিলো না। কী অসহ্য উদ্‌ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিময় এক সময় – ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক।

সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞাতসারে সেদিন একই সঙ্গে দুটি ভালোবাসা থেকে আমি দূরে চলে গিয়েছি। আমার দেশটির জন্যেও আমার ভালোবাসা কিছু কম নয়। এই আজও, প্রায় তিরিশ বছর পরে, দুটি ভালোবাসাই আমার জীবনে সমান জাগ্রত। দূরবর্তী থেকে ভালোবেসে যাওয়াই আমার নিয়তি।

১০.

প্রথমে স্বপ্ন বলে বোধ হয় না, তবু হয়তো স্বপ্নই। ঘুম ছিলো না, শুধু শুধু চোখ বুজে শুয়ে থাকা। রাত প্রায় দেড়টা, কাল অফিসে পৌঁছতে হবে একটু সকাল সকাল, সাপ্তাহিক টীম মিটিং। অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করি। দিনভর কাজের শেষে ঘরে ফিরেছি সাড়ে আটটার দিকে। রান্নাবান্না কিছু করা নেই, বাইরে খেয়ে এসেছি। রান্না করতে ইচ্ছে করে না, করিও না। বেশিরভাগ বাইরে খাওয়া হয়। তা-ও একঘেয়ে হয়ে যায় একসময়। কিছু করার নেই, একা মানুষের জীবন এরকমই হওয়ার কথা।

নির্ঘুম বিছানায় ছটফট করা এক ধরনের শাস্তিই। বাল্যকালে শিখেছিলাম অন্ধকার ঘরে চোখ বুজে কল্পনায় মেষ গণনা করতে থাকলে একসময় স্নায়ু অবসন্ন হয়ে পড়বে, তখন ঘুমের আর না এসে উপায় থাকবে না। আমার মেষ গণনার কৌশল ব্যর্থ হয়। একশো, নিরানব্বই, আটানব্বই করে উল্টোদিকে গুনে শূন্য পর্যন্ত আসাও হয়ে যায় বার তিনেক। একসময় মনে হয় একটু তন্দ্রামতো হয়েছিলো, তখনই দেয়ালের লেখাটি দেখি। চোখের সামনে নেই, তবু পরিষ্কার পড়া যায়। কালো বড়ো হরফের চিকা। একাত্তরের যুদ্ধাস্ত্রগুলোকে আরেকবারের জন্যে গর্জে উঠতে বলা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাভবনের দেওয়ালে উৎকীর্ণ ছিলো। তিয়াত্তর-চুয়াত্তরে দেখা দেয়ালের লিখনটি তিরিশ বছর পরে ফিরে আসে।

তন্দ্রা ছুটে গেলে প্রথমে ভাবি বিছানায় উঠে বসি। স্বপ্নটি নিয়ে একটু ভাবা যেতে পারে। উঠি না। পাশ ফিরে চোখ বুজি, স্বপ্ন যদি ফিরে আসে! উঠে বসার চেয়ে শুয়ে থাকা অনেক আরামের। শরীর এখন কেবল আয়েশ খোঁজে। একটা সময় ছিলো, তখন দিনে চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশি ঘুমালে মনে হতো কতোটা সময়ের অপচয় হয়ে গেলো। শিশুরা যেমন জোর করে জেগে থাকতে চায় – ঘুমিয়ে পড়লেই দারুণ কিছু একটা ঘটে যাবে, দেখা হবে না! একসময় ভাবতাম, দিনে আট ঘণ্টা ঘুমালে ষাট বছরের আয়ুতে শুধু ঘুমিয়ে কাটবে বিশটি বছর। কী অপচয়! কোনো মানে হয়! আজকাল আর সেসব হিসেব মনে পড়ে না।

আমার দিন শুরু হয় কাকডাকা ভোরে। এ দেশে এসে অবধি এই ঊনত্রিশ বছরেও কাক দেখিনি একটিও, শুধু দেশে ফোন করলে কখনো ব্যাকগ্রাউন্ডে কাকের ডাক শোনা হয়। তবু আমার ভোর এখনো কাকডাকা ভোর। বিছানা ছেড়ে এক কাপ ব্ল্যাক কফি খেয়ে ঘুম তাড়ানো। হাতমুখ ধুয়ে বাইরে হাঁটতে যাওয়া, আধঘণ্টা হাঁটা। এইসময়ে প্রতিদিন নির্ভুলভাবে বাবাকে ভাবি, জীবনে আরো অনেককিছুর মতো প্রাতঃভ্রমণের এই অভ্যাসটি আমার মধ্যে তিনি কীভাবে যেন সঞ্চারিত করে দিয়ে গেছেন। অথচ তাঁর জীবনকালে আমি কখনো ভোরে হাঁটতে যাইনি। ফিরে এসে গোসল সেরে অফিসের জন্যে তৈরি হওয়া। অফিসের সময় এমনিতে আটটা-পাঁচটা হলেও কাজের ধরণটি এমন যে কখনো তা ঘড়ি ধরে চলে না। প্রায় প্রতিদিনই গড়ে বাড়তি ঘণ্টা দুয়েক থাকতে হয়, তেমন হলে আরো বেশি, এমনকি রাতভর। ফলে, কিছু দেরি করে অফিসে যাওয়ার স্বাধীনতাটি নেওয়া চলে। আমি সচরাচর ন'টার দিকে পৌঁছাই। কায়িক পরিশ্রম কিছু নেই, তবু একটানা বসে দীর্ঘ সময় কাজ করলে তারও ক্লান্তি আছে।

জানা ছিলো, বয়স হলে ঘুম কমে যায়। কিন্তু ঠিক কতো বছরে সেই বয়সে পৌঁছানো যায়? পঞ্চাশ? পঞ্চান্ন? ষাট? বেশিদিন আগের কথা নয়, কারো বয়স বেয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশ শুনলে মনে হতো, লোকটা তো বুড়ো! তখনো মনে আসেনি আমি ওই বয়সে গেলে অন্য কেউ আমাকে বুড়ো ভাববে। জিনিস একই, শুধু জায়গা বদলে গেছে। একসময়ের দর্শক পঞ্চাশে পড়ে এখন নিজেই দ্রষ্টব্য। আজকাল

ঘুমিয়ে মন ভরে না, জেগে উঠলে চোখের পাতা ভারী, সারা শরীরে আলস্য লেগে থাকে আঠার মতো। তবু ঘুম কি আর আসে! এখনও চোখ বুজে শুয়ে থাকাই সার হয়, ঘুম আর ফিরে আসে না, স্বপ্নও না।

পরশু আসিফের ছেলের জন্মদিনের অনুষ্ঠান ছিলো। নিজের সংসারী হওয়া হয়নি, কিন্তু বন্ধুবান্ধবের বাচ্চারা অবিলম্বে কীভাবে যেন খুব দ্রুত আমাকে তাদের দলের একজন বলে গণ্য করে নেয়। ঠাট্টা করে বাচ্চাদের বাবা-মাকে বলি, ওরা ভালো মানুষ ঠিকই চেনে!

আসিফের ছেলেটি নিজে ফোন করেছিলো, কাকু আমার জন্মদিন।

চিনতে ভুল হয়নি, তবু ওর নামটি আমার ভারি পছন্দের। বিশেষ করে ওর নিজের মুখে খুব মিষ্টি শোনায়। পুট পুট করে সুন্দর উচ্চারণে বাংলা বলে। অথচ জানা কথা, স্কুলে যেতে শুরু করলে এই ছেলে বাংলা বলা একেবারে বন্ধ করে দেবে। বয়ঃসন্ধির আগেই না-বলায় এমন অভ্যস্ত হয়ে যাবে যে কেউ বাংলায় কথা বলতে গেলে হ্যাঁ হুঁ না এইসব বলে পালাতে চেষ্টা করবে। বড়োজোর মার্কিনি সুরে কিছু বাংলা বুলি উগরে দেবে। এ দেশে সব বাঙালির ঘরেই অনেক বছর ধরে দেখছি এরকম।

জিজ্ঞেস করি, আমিটা কে?

আমি আসমান, তুমি চিনতে পারোনি কাকু?

আসিফ আর তার বউ রুম্মানের নাম মিলিয়ে ছেলের নাম আসমান। বলি, আমি বাবা জমিনের মানুষ, আসমানের খবর কী করে পাই? তা তোর জন্মদিনটা কবে রে বাপ?

কাল। তুমি না এলে কিন্তু আমি কেক কাটবো না। মনে থাকে যেন।

তা থাকবে। তুই কতো বছরের বুড়ো হবি এবার?

চার। আমি কিন্তু বুড়ো না, বুড়ো তুমি।

আমি বুড়ো হলে তোর বন্ধু হলাম কী করে?

তোমার মাথায় কতো পাকা চুল।

চুল পাকলে কি বুড়ো হয় রে, বোকা বুড়ো...

ফোন রেখে মনে মনে ভাবি, বুড়োটা তাহলে হয় কীভাবে? এক দেশে এক লোক ছিলো। লোকটি কম বয়সে তার দেশের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করেছিলো। অনেক দুঃখকষ্টের ভেতর দিয়ে দেশ স্বাধীন হলো। তার দেশের দখল নিয়ে বসা শত্রুরা পরাজিত হয়ে ফিরে গেলো। তার দেশের কিছু মানুষ সেই বিদেশীদের পক্ষ নিয়ে ধর্মের নামে অনেক অপকর্ম করেছিলো, দেশ স্বাধীন হলে তারা লুকিয়ে পড়লো। লোকটা, সেই সময়ের তরুণ মুক্তিযোদ্ধা, আরো অনেকের মতো স্বপ্ন দেখেছিলো অতি উজ্জ্বল একটি ভবিষ্যতের। সত্যি হয়নি তার কিছুই। তার স্বপ্নের রং ক্রমে ফ্যাকাশে হতে থাকে, আসে অনিশ্চয়তা, নিষ্ফল ক্রোধ ও হতাশা। লুকিয়ে থাকা পরাজিত মানুষগুলি ধীরে ধীরে মুখ বাড়ায়, সুযোগমতো বেরিয়ে আসতে থাকে, সামাজিক প্রতিষ্ঠাও পেয়ে যায়। লোকটা বুড়ো হয়ে যায়, যখন সে আর প্রকাশ্যে বলার সামর্থ্য ধরে না যে সে স্বাধীনতাযুদ্ধের এক যোদ্ধা ছিলো, একসময়ে জয়ী হয়েও আজ পরাজিতের মতো নতমুখ হয়ে থাকতে হয় তাকে। পরাজিতরা আস্ফালনের অধিকার ও ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে আর যোদ্ধাকে পলাতক পরবাসী হয়ে যেতে হয়।

যুদ্ধের দিনে আমাদের দলনেতা ছিলেন কবির ভাই, তার বউ শাহানা এখন কবির ভাইকে ডাকে বুড়া মুক্তিযোদ্ধা বলে। একদিন শাহানা ফোনে আমাকে বলে, কীসের মুক্তিযোদ্ধা রে তোরা? জয় বাংলা কইয়া যুদ্ধ করলি, দেশ স্বাধীন হইলে পাছা উবুত কইরা ঘুমাইয়া থাকলি আর সব রাজাকারগুলান পাকিস্তান জিন্দাবাদ কইয়া তগো ... মাইরা দিয়া গেলো গা ...!

আসমানের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে লোকজন ভালোই হয়েছিলো। আমেরিকানরা বাচ্চাদের জন্মদিনে তাদের কিছু বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে পিৎজা প্ল্যানেট বা ওই জাতীয় কোথাও নিয়ে যায় কয়েক ঘণ্টার জন্যে। সেখানে বাচ্চাদের খেলাধুলার দেদার আয়োজন, খেলা হয়ে গেলে ভরপেট পিৎজা ও কেক খেয়ে বাড়ি যাও। বাবা-মায়েরা সেখানে আমন্ত্রিত হয় না। ছোটো ছেলেমেয়েদের জন্যে আয়োজন এইরকমই হওয়া উচিত, ওদের আনন্দ-ফুর্তি হলেই হলো। কিন্তু বাঙালি বাবা-মা নিজেরা নিমন্ত্রিত না হলে এবং পাতে পোলাও-বিরিয়ানি-মাংস না পেলে অসন্তুষ্ট হয়, অতৃপ্ত থাকে। হোক তা বাচ্চাদের জন্মদিনের অনুষ্ঠান! একবার বারো বছর বয়সী এক মেয়ের জন্মদিনে গিয়ে দেখি, মেয়েটির একটিমাত্র বান্ধবী উপস্থিত, কয়েকটি শিশু বাদ দিলে বাকি পঁচিশ-তিরিশজন মানুষের সবাই বয়স্ক, মেয়েটির বাবা-মায়ের বন্ধুবান্ধব।

আসিফের লিভিং রুমে সোফায় অনেক লোকজন গাদাগাদি করে বসেছে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে কিছু বাড়তি চেয়ার বসানো হয়েছে, তারই একটিতে বসে পড়ি। উপস্থিতদের কয়েকজনকে চিনি, অধিকাংশ অপরিচিত। আমি মানুষ হিসেবে তেমন মিশুক নই, এতো বছরেও এই শহরে বেশি মানুষকে চেনা হয়নি। বাবুলের সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা, মাথায় চুল কমেছে, ওজন বাড়তির দিকে। জানালো গ্যাস স্টেশনের ব্যবসা তার, দুটি ছেলে নিয়ে তাদের সংসার। পরিচিতদের সঙ্গে কিছু মামুলি কুশল বিনিময় করি। পর্বটি সংক্ষিপ্ত হয়, কেননা তখন রাজনীতির কথা হচ্ছে, যা নির্ভুলভাবে উত্তাপ অর্জন করে থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, এইসব আলোচনা কেউ নিচুকণ্ঠে বা স্বাভাবিক কথা বলার ঢঙে করে না। হয়তো পারা যায় না। এমনকি, সিএনএন-এর রাজনীতি বিষয়ে বিতর্কের অনুষ্ঠান ক্রসফায়ার, সেখানেও দেখি সিনেটররা গলা চড়ায় – চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে, চিৎকার করে গলার রগ ফুলিয়ে প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডানোর চেষ্টা করে।

তর্কটি এখনো চিৎকারের পর্যায়ে যায়নি, তবে তার সমস্ত লক্ষণ ও উপাত্ত মজুত আছে দেখতে পাই। তিন-চারজনে মিলে যথারীতি দুটি পক্ষ দাঁড়িয়ে গেছে। আর সবাই শ্রোতা। আলোচনাটি মনে হয় আগেই শুরু হয়েছিলো, অবধারিতভাবে আওয়ামী লীগ-বিএনপির শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব ও তর্ক। শেখ মুজিব না জিয়া বড়ো, হাসিনা-খালেদার মধ্যে কে শ্রেয়তর – এইসব গড়িয়ে কেমন করে প্রসঙ্গ চলে যায় বাংলা ভাই-এ, তারপরে র‍্যাব-রক্ষীবাহিনীর তুলনামূলক বিচার। কখন আবার প্রসঙ্গ পাল্টে গেছে খেয়াল করিনি, আসলে শোনার ইচ্ছেও ছিলো না। যার যার পছন্দ ও মত প্রতিষ্ঠা করার জন্যে অকারণ হৈ চৈ।

দেশে এখন কীরকম জানি না, খুব আলাদা হওয়ার কথা নয়, তবে পরবাসী বাঙালিদের মধ্যে অন্যের রাজনৈতিক বিশ্বাস বা আনুগত্য বিচারের পদ্ধতিটি খুব অদ্ভুত। বেশ কয়েক বছর আগের কথা, তখনো ইন্টারনেটে বাংলা দৈনিকের আবির্ভাব ঘটেনি। একদিন বাঙালি মালিকানার একটি দোকানে নিউ ইয়র্কের বাংলা সাপ্তাহিকের খোঁজে গেছি। একটিমাত্র পত্রিকার কয়েকটি কপি পড়ে আছে, অন্যগুলো, বিশেষ করে আমি যেটি নিয়মিত কিনে থাকি, নেই। দোকানে বসা ভদ্রলোকটি অপরিচিত। জিজ্ঞেস করি, আর কাগজগুলা কি আসে নাই?

ভদ্রলোক জানালেন যে, সব বিক্রি হয়ে গেছে এবং যে পত্রিকার কপি অবশিষ্ট আছে সেটির কথা উল্লেখ করে জানালেন, এইটা নিয়া যান, সবচে বেশি চলে।

আমি বলি, এই পত্রিকা আমার বিশেষ পছন্দের না।

ভদ্রলোকের মুহূর্তমাত্র লাগে সিদ্ধান্তে আসতে। জিজ্ঞেস করেন, আপনে কি আওয়ামী লীগ করেন?

সেই দোকানে আর কোনোদিন যাওয়ার উৎসাহ আমার হয়নি।

এখন হঠাৎ একজনকে বলতে শুনলাম, তাহলে আমরা বলতেছি না ক্যান হানাদার বাহিনী বলতে আমরা কাকে বুঝি? তাদের নামনিশানা পরিচয়টা কি?

প্রতিপক্ষ অতি উচ্চকণ্ঠ এবং যাবতীয় জ্ঞানের আধার, এমন ধারণা দিতে উদগ্রীব। তিনি বলেন, না বললে বোঝা যায় না? আর কবে কী ঘটছে, সেইসব নিয়া এখন আর টানাটানির দরকার কী?

তাহলে ইতিহাসের দরকার নাই বলতেছেন?

তা বলি নাই, ইতিহাসের জায়গায় ইতিহাস। কিন্তু রেষারেষি হানাহানি হইতে পারে, সেইসব কথা না তুললেই হয়।

প্রথমজন যুক্তি দেন, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের ক্রিমিনালদের তাহলে এখনো খোঁজ করে ক্যান? তাতে হানাহানির কথা কেউ বলে না। কিন্তু গোলাম আযমের নামে, রাজাকারদের নিয়া কিছু বললে আপনাদের জান পোড়ায়।

তারাও তো আমাদের দেশের মানুষ। আমাদেরই ভাই-বেরাদর।

তা আপনার পেয়ারের ভাই-বেরাদরগুলি যুদ্ধের সময় কই ছিলো? কী করছিলো? দেশ স্বাধীনের পরে পলায়া ছিলো ক্যান? তারা যাদের মারছিলো তারা কোন দেশের মানুষ ছিলো, বলেন তো?

সবজান্তা অন্য কথা বলেন এবার, আরে রাখেন মিয়া, ইন্ডিয়ান আর্মি স্বাধীন কইরা দিছিলো বইলা...

এতোক্ষণ অমনোযোগে একটি পুরনো ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে যাচ্ছিলাম। কথাবার্তার কিছু কানে আসছিলো, কিছু শুনিনি। এই ধরনের আলাপ কানে তোলার দরকার মনে হয় না বলে সচরাচর চুপচাপ থাকি। নেহাত অসহ্য লাগলে উঠে বাইরে যাই, সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকি। শেষের কথাটি মাথায় ধাক্কা দিয়ে আমাকে সচকিত করে দেয়। ইন্ডিয়ান আর্মি বাংলাদেশ স্বাধীন করে দিয়েছিলো!

অজান্তে বলে বসি, চুপ করেন তো ভাই। এইসব বাজে কথা কই পাইলেন? জানেন আপনে কী বলতেছেন?

ভদ্রলোককে চিনি না, আগে কোথাও দেখেছি বলেও মনে করতে পারি না। অচেনা কাউকে এ ধরনের কথা বলে আমি নিজেকেই অবাক করে দিয়েছি।

ভদ্রলোক গলা আরেক পর্দা তুলে বলেন, জানি বইলাই তো বলতেছি। বাংলাদেশের কেউ যুদ্ধ করে নাই, বাংলাদেশ স্বাধীন কইরা দিয়া গ্যাছে ইন্ডিয়ান আর্মি। তারা হাতে ধইরা স্বাধীন না করলে আজও আমরা পাকিস্তানীই থাকতাম। ইস্ট পাকিস্তানের কেউ বাংলাদেশ চায় নাই।

আপনি কিছুই জানেন না। জানলেও বোঝেন নাই কী বলতেছেন। ইন্ডিয়া আমদের হেল্প করছিলো, সেইটা তো অস্বীকার করার কিছু নাই। কিন্তু তারা আমাদের স্বাধীনতা হাতে তুইলা দিয়া গেছে, এইটা মনে করার কোনো কারণ নাই।

তাহলে ইন্ডিয়ান আর্মি আসছিলো কী করতে?

মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টায় আস্তে আস্তে বলি, আপনার হয়তো জানা নাই, পাকিস্তানীরা মুক্তিবাহিনীর মারের চোটে দিশা না পাইয়া ইন্ডিয়ারে অ্যাটাক করছিলো। আপনার কি জানা আছে, ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের যুদ্ধ লাগার আগে বাংলাদেশের অনেক জায়গা থিক্যা পাইক্কারা পলায়া গেছিলো? মুক্তিবাহিনীর হাতে মার খাইছি, এই কথা তো তারা তাবৎ দুনিয়ার কাছে বলতে পারে না, ইন্ডিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ লাগলে আমেরিকা-চীনের কাছে নালিশ করা যায়। তাই করছিলো তারা। তা ইন্ডিয়া কি তখন বইসা আঙুল চুষবো, না উল্টা মার দিবো?

মুক্তিবাহিনী বইলা কিছু কি আসলে ছিলো নাকি?

বলে কী! মাথায় রক্ত উঠে যায়। জিজ্ঞেস করি, কিছু মনে করবেন না, আপনার বয়স কতো? মানে যুদ্ধের সময় আপনার বয়স কতো ছিলো?

এবার ভদ্রলোকের গলা আরো চড়ে যায়। বলে, আমার বয়স দিয়া আপনি কী করবেন? ছয় বচ্ছর বয়স ছিলো তখন আমার।

আমি আসলে বুঝতে চাইতেছিলাম, যুদ্ধের সময় আপনের বোঝার বয়স হইছিলো কিনা, কিছু বুঝছিলেন কিনা। খালি শোনা কথা নিয়া চিল্লাইতেছেন। কথা শুনলে মনে হয় বোঝার বয়স আপনার এখনো হয় নাই। তা তখন না দেখলে না বুঝলে বইপত্র পড়লেও কিছু জানতে পারতেন।

মনে করেন আপনি একলাই পড়ছেন। আমিও কিছু পড়ালেখা কইরাই কথা বলতেছি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার উপরে একখান বইয়ের নাম বলতে পারবেন যেইটা আপনি পড়ছেন?

পড়ছি, নাম মনে নাই।

পেশাদার উকিলের ভঙ্গিতে বলি, তার মানে পড়েন নাই। পড়লে মনে থাকবে না ক্যান? মুখে মুখে শোনা মিছা কথাগুলি তো মনে রাখছেন ঠিকই।

তা ভাইজান, আপনি এতো কথা বলতেছেন, আপনে যুদ্ধ করছিলেন?

যদি বলি করছি?

তখন আপনার বয়স কতো আছিলো?

সতেরো।

হাসাইলেন, সতেরো বচ্ছরের পোলা পাকিস্তান আর্মির সঙ্গে যুদ্ধ করছে?

আমার তো তাও সতেরো। বগুড়ায় আমার বন্ধুর ছোটো ভাই টিটু ক্লাস নাইনে পড়তো, পনেরোর বেশি বয়স হওয়ার কথা না। মার্চ মাসের শেষে যখন রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থিক্যা পাকিস্তানীরা বগুড়ার দিকে আসে, এই টিটু কয়েকজন বন্ধুরে নিয়া এক দোতলা দালানের ছাদে গাদা বন্দুক হাতে যুদ্ধ কইরা মারা পড়ে। আরো শুনতে চান? ঢাকা শহরের আরেকজন, তার নামও টিটো, বয়স চোদ্দো বছর, সাভারে যুদ্ধ করতে গিয়া মারা গেছিলো দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র কয়দিন আগে। তার কবর এখনো ইচ্ছা করলে দেখতে পারবেন জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির গেটের সামনে, সেইখানে তার বয়সও লেখা আছে।

আপনি যা বলতেছেন, তা সত্যি না-ও হইতে পারে।

সবজান্তার কথা কানে তুলি না। বলি, ফ্রেডি অ্যাডুর নাম হয়তো শোনেন নাই। সকার খেলে, বয়স চোদ্দো বছর। আফ্রিকায় জন্ম। তারে বলা হইতেছে আমেরিকান সকারে সেরা প্লেয়ারগুলির একজন। এইটারে আপনি কী বলবেন? আসলে বয়স দিয়া সব বিচার হয় না। আপনি দেখেন নাই, দশ-বারো বছরের পোলাপানও যুদ্ধ করছে। আমার দেখা আছে। আপনি দেখেন নাই, শোনেন নাই, শুনলেও কিছু বোঝেন নাই। আপনি বোঝনে নাই, তার মানে যে সব মিছা কথা তা কিন্তু না।

আপনি ক্যামনে জানেন?

আমি সেইখানে ছিলাম। আমি নিজের চোখে দিনগুলি দেখছি, আপনি দেখেন নাই। বুকের মধ্যে গুলি খাওয়া মানুষরে চিল্লায়া জয় বাংলা বলতে শুনছি, আপনি শোনেন নাই। যুদ্ধের ময়দানে পাশাপাশি ছিলাম, গোলাগুলি থামলে দেখি পাশের জন আর নাই। একদিকে লড়াই জেতার খুশি, পাশে রক্তমাখা বুক নিয়া আমার বন্ধু শোয়া, তার মাথার খুলি নাই, নড়ে না চড়ে না, কথাও কয় না। তাকায়া দেখি আর ডুকরায়া কানতে ইচ্ছা হয়, কানতে পারি না। মনে হয়, ওইটা আমিও হইতে পারতাম। আপনার জীবনে এইরকম কিছু জানা আছে? থাকলে এইসব নিয়া কথা বলবেন। যদি আন্দাজও করতে পারেন, তাহলে বলবেন। না হইলে চুপ যান, না জাইনা কিছু বলবেন না। ওই মরা মানুষগুলিরে অপমান না হয় না-ই করলেন।

ভদ্রলোক পুরনো প্রসঙ্গে যান, আপনে বলতে চান ইন্ডিয়া আর্মি না পাঠাইলেও বাংলাদেশ স্বাধীন হইতো?

আমি যদি বলি হইতো, আপনি বলবেন হইতো না। তার ফয়সালাটা হয় কীভাবে? খালি ইন্ডিয়ার কথা বললেন, সেই সময় রাশিয়া আমাদের পাশে দাঁড়ায় নাই? এইসব কথায় ফায়দা কি? বরং আপনি চাইলে কিছু বইপত্র আমি আপনারে দিতে পারি, পড়লে কিছু ইতিহাস জানতে পারবেন।

আপনাদের মতন মানুষগুলি যতোসব প্যাঁচ লাগায়। আপনারা কই পাইলেন একাত্তর সালে তিরিশ লক্ষ লোক মারা গেছিলো, দুই লক্ষ মাইয়ার ইজ্জত গেছে? গুনতিটা করলো কে?

ভদ্রলোকের পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া করার স্বভাব মনে হয়। এক প্রসঙ্গ থেকে আরেক প্রসঙ্গে যান লাফিয়ে লাফিয়ে। আমি ধীর গলায় জবাব দিই, একটা সত্যিকারের ঘটনা শুনাই আপনারে। আটানব্বই সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে, ছাব্বিশে মার্চ যে স্বাধীনতা দিবস সেইটা জানেন তো নাকি তা-ও মনে করায়া দিতে হবে, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে খবরের কাগজে যুদ্ধের সময় তিরিশ লাখ মানুষের শহীদ হওয়া আর দুই লাখ নারীর লাঞ্ছিত হওয়ার কথা বইলা লেখালেখি হইলে পাকিস্তানীদের তা পছন্দ হয় নাই। তারা ইসলামাবাদে বাংলাদেশের হাই কমিশনাররে ডাইকা নিয়া বলে, এইসব প্রোপাগান্ডা বন্ধ করেন, কারণ এগুলি ঐতিহাসিকভাবে অসত্য এবং সংখ্যাগুলি অনেক বাড়ায়া বলা হইতেছে। আপনে যেমন একটু আগে বললেন। তখন বাংলাদেশের হাই কমিশনার কিউ এ এম এ রহিম খুব বিনয়ের সাথে পাকস্তিানীগুলিরে বললেন, সঠিক সংখ্যাটা তাহলে আপনারাই জানায়া দিলে ভালো হয়!

তাতে কী হইলো?

জানতাম, ভদ্রলোকের মাথায় হয় জিনিসটা ঢুকবে না, অথবা না বোঝার জন্যে তিনি তৈরি হয়েই আছেন। ব্যাখ্যা করে বলি, পাকিস্তানীরা তো আজ পর্যন্ত স্বীকারই যায় নাই যে তারা একাত্তর সালে নিরীহ

বাঙালিদের কচুকাটা করছিলো, মহিলাদের ইজ্জতহানি করছিলো। রহিম সাহেব যখন তাদের বললেন যে সঠিক সংখ্যাটা আপনারাই দিয়া দ্যান, পাকিস্তানীরা কী বিপদে পড়লো বুঝছেন? যদি বলে তারা দুইজন মানুষও মারছে, তাহলেও তো দোষ স্বীকার করা হয়। সেইটা তারা জীবনেও স্বীকার করতে চায় নাই, করে নাই, সে আশাও নাই। রহিম সাহেব খুব সুন্দরভাবে জুতাটা মারছিলেন। তিনি আরো বলছিলেন, দেশের স্বাধীনতার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করছিলো যে মানুষগুলি তাদের সম্মান জানাইলে যদি পাকিস্তানের মন খারাপ লাগে, সম্পর্ক খারাপ হয়, তাতে বাংলাদেশের তো কিছু করার নাই। জানেন, অবাক লাগে ওই পাইক্কাদের মুখের কথা আপনার মুখে আইসা পড়লো ক্যামনে। আরো শুনতে চান? সেই সময় জামাতী-রাজাকারগুলি ক্ষমতায় ছিলো না। তখনকার সরকার ঢাকায় পাকিস্তানী হাই কমিশনার মিসেস রিফাত ইকবালরে ফরেন মিনিস্ট্রি অফিসে ডাইকা পরিষ্কার জানায়া দিছিলো, দ্যাখেন, পাকিস্তান যদি একাত্তরের ঘটনার জন্যে মাফ চায়, আমরা মাফ কইরা দিতে পারি, তাদের দোষগুলি ভুইলা যাইতেও রাজি, কিন্তু স্বাধীনতার জন্যে যে মানুষগুলি জান দিলো ইজ্জত দিলো সেই মানুষগুলিরে ভুলি ক্যামনে?

ভদ্রলোকের সঙ্গে আর কথা বাড়াতে ইচ্ছে করে না। এইসব নিয়ে তর্ক করার কোনো মানে নেই। করিও না। আজ যে কেন করতে গেলাম! সিগারেট খাওয়ার অজুহাতে উঠে পড়ি। বাইরে কেউ নেই, কেউ লক্ষ্য করছে না দেখে গাড়িতে উঠে পড়ি। নিজের ঘরে ফিরি।

আমি না থাকলে আসমান কেক কাটবে না বলেছিলো, তার সঙ্গে দেখাও হলো না। কাল সকালে পুষিয়ে দিতে হবে। ঘরে ফেরার পথে মনে পড়েছিলো – একাত্তরের হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার!

১১.

ঘরে ফিরে দিনু ভাইকে ফোন করি। দিনু ভাই থাকেন কানাডায় নায়াগ্রার কাছে একটি ছোটো শহরে। মন-মেজাজ ঠিক না থাকলে মাঝেমধ্যে তাঁকে ফোন করি, অনেক কথা বলি। যুদ্ধের সময় মিলিটারি তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো ছোটো ভাই লিনু ও দুলাভাই আলতাফ মাহমুদসহ। দুই ভাই অর্ধমৃত অবস্থায় ফিরে এলেও আলতাফ মাহমুদের খোঁজ কোনোদিন আর পাওয়া যায়নি। মিলিটারির সেই নির্যাতনের চিহ্ন আজও দিনু ভাই তার শরীরে বহন করেন।

সন্ধ্যায় অযথা তর্কে জড়িয়ে পড়ার ঘটনাটি জানিয়ে বলি, আরেকটা যুদ্ধ সত্যি দরকার, দিনু ভাই।

কিন্তু আমরা যে বুড়া হয়া গেলাম রে, পাগলা। আমাদের কতোজন মারা গেলো, অনেকরে মাইরা ফেললো। যারা আছে তাদের হাল তো জানিস। সাদী শুনি ডায়াবেটিসের রুগী। মণ্টুর প্যাটে আয়েশের চর্বি। শাজাহান ব্যবসা ছাড়া কিছু বোঝেই না।

আমি যোগ করি, মুনির ভাইয়ের কিছু মনেই নাই।

দিনু ভাই পরম হতাশায় বলেন, একসময় ভাবতাম, আশাও করতাম, পরের জেনারেশন কিছু একটা হয়তো কইরা ফেলবে। কিন্তু এখন যা দেখি-শুনি, ক্যামনে আর সে ভরসা করি? যুদ্ধের সময় শেখ মুজিবের নামে নফল রোজা রাখে নাই, এইরকম বাড়ি বাংলাদেশে ছিলো? আজ পোলাপানরা ইস্কুলের বইয়ে যেই গল্প পড়তেছে সেইখানে শেখ মুজিব বইলা তো কেউ নাই। তাহলে? আজকাল তো আমারও মাঝে মাঝে মনে হয়, লোকটা কি আসলেই ছিলো? তারে কি আমরা স্বপ্নে পাইছিলাম? রূপকথার রাজপুত্র নাকি সে? এই পোলাপানরা যুদ্ধ দেখে নাই, সেইটা তাদের দোষ না, হয়তো গল্পটল্প শুনছে। এইসব তো তাদের কাছে রূপকথার মতো লাগবে।

তবু কিছু একটা তো হইতে হবে, দিনু ভাই। এইভাবে আর কতোদিন?

দিনু ভাই বলেন, আশা করতে আমারও ইচ্ছা করে, কিন্তু সম্ভব মনে হয় না। জামাতীরা রাজাকাররা দলেবলে ভারী হইছে, তাদের দাপট বাড়ছে। খালি দাপট না, এখন তো মুক্তিযুদ্ধের কথা বললে জানে মাইরা ফেলে। হুমায়ূন আজাদরে কী করলো দেখলি তো। বাংলাদেশে একাত্তরের কথা বলার মানুষ দিন দিন খালি কমতেছে। যারা আছে, তাদের গলায়ও আর জোর নাই দেখি।

দিনু ভাই নতুন কিছু বলেননি, আমিও না। জানা কথা, সবই বুঝি। এইসব আশা শূন্যে ঘর বানানোর অলীক কল্পনা, আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখা শুধু। গলা নামিয়ে বলি, অস্ত্র জমা দিছি, ট্রেনিং জমা দিই নাই – এগুলি এখন খালি কথার কথা। আমরা তো খরচ হয়া গেলাম, দিনু ভাই।

Now we are old and grey, Fernando
And since many years I haven't seen a rifle in your hand
Can you hear the drums, Fernando?
Do you still recall that fateful night we crossed the Rio Grande?
I can see it in your eyes
How proud you were to fight for freedom in this land.

১২.

কতোবড়ো দুর্ভাগ্য আমাদের, তাই ভাবি। কী করে যে কী হয়ে গেলো, এইসব কথা এখন আর প্রকাশ্যে বলা সম্ভব হয় না। দেশে ক্ষমতাবানরা বলতে দেয় না, শুনতেও চায় না। আর এই পরবাসে আমরা একদিন দেশের জন্যে যুদ্ধ করেছি শুনলে মানুষ অবাক হয়ে তাকায়, ভাবে পাগল নাকি? কথায় কথায় তারা আজ বাংলাদেশের নিন্দামন্দ করে। তাদের কথার প্রতিবাদ করলে, একমত হতে না পারলে ঠাট্টা-ব্যঙ্গ শুনি। দেশের জন্যে এই ভালোবাসার কথা আজ বড়ো গোপনীয়। কথা বলতে হবে শুধু নিজের সঙ্গে, আমার লেখার খাতায়।

মাঝে মাঝে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকেই বলি, তুমি যে একটি কাপুরুষকে দেখছো, তা জানো? অঘটনগুলো যখন ঘটতে শুরু করলো, তুমি তাদের বিরুদ্ধে বলতে পারতে, কিছুই বলোনি। এবং সেই না-বলার কারণে তুমি নিজে সেই একই রকম দুষ্কর্মে দোষী। অথচ আমি তো জানি, একেকসময় যখন মুখ ফুটে কিছু বলতে গেছি, দেখি আমি একা। আর কেউ সেসব নিয়ে কিছু বলে না। চারদিকে তাকাই, সম্মতি ও সমর্থনের অপেক্ষা করি। দেখি সব পাথরের মতো ভাবলেশহীন একেকটি মুখ, তাতে কোনো অভিব্যক্তি ফোটে না।

অনেক দেরি হয়ে গেছে। আজ কে আর শুনবে সেসব কথা? আমার সামনে নিরেট দেওয়াল উঁচু হয়ে দাঁড়ানো। আমি কি দেওয়ালকে উদ্দেশে কিছু বলতে পারি? তারা উল্টে চিৎকার করে থামিয়ে দেয় আমাকে। কাউকে কোনো একটি কথাও বলা হয় না, যাকে বলতে যাই সে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দেওয়ালের কথা শোনে। আজও আমার দেশের কতো মানুষ অস্বীকার করে অথবা চোখ বন্ধ রেখে বিশ্বাস করতে চায় যে, একাত্তর বলে কোনো একটি বছর পৃথিবীতে এসেছিলো এবং যুদ্ধ করে বাংলাদেশ নামের একটি রাষ্ট্রের উত্থান ঘটাতে হয়েছিলো, আমাদের স্বাধীনতা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়নি। অফুরান প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও তারা বিশ্বাস করে আমাদের যুদ্ধটি আসলে কোনো যুদ্ধ ছিলোনা, সেই সময়ে লক্ষ লক্ষ নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করার ঘটনা আদৌ ঘটেনি, মেয়েদের লাঞ্ছিত করা হয়নি। অথচ লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই যুদ্ধের ক্ষত আজও শরীরে ও হৃদয়ে বহন করে, মানুষ এখনো তাদের হারিয়ে ফেলা স্বজনদের স্মরণে অশ্রুপাত করে।

ওদের মনোভাবটি আমি বুঝি, এইসব স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ হলো তাদের এখনকার ক্ষমতা ও সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিটি দুর্বল হয়ে যাওয়া। তা তারা করবে কেন? ফলে, তাদের মতামত বা বিশ্বাস নিয়ে তারা হয়তো আমার মতোই একমুখী ও একরোখা।

তারপরেও আমি বিশ্বাস করি, সত্য একদিন প্রকাশিত হবে, ক্রমশ হচ্ছে। এই সত্য প্রকাশিত হলে তাকে স্বীকার করে নিয়েই বোঝাপড়ার একটা পথ তৈরি হতে পারে। এটি ঠিক যে দীর্ঘদিনের লালিত গভীর এই ক্ষতের নিরাময় সময়সাপেক্ষ। যারা

স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা ও শত্রুতা করেছিলো বিশ্বাসঘাতকতাময় কার্যকলাপে, আজও তারা একবারের জন্যেও ভুল স্বীকার করেনি, কৃতকর্মের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করেনি, দুঃখিতও নয়। তাদের কৃত অপরাধের শাস্তি হয়তো কোনোদিনই হবে না, রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের যুদ্ধাপরাধ থেকে অব্যাহতির বিধান দেওয়া হয়েছে। মনে মনে বলি, ক্ষমিতে পারিলাম না যে, ক্ষমো হে মম দীনতা...।

আজকের প্রজন্ম, যারা যুদ্ধ দেখেনি এবং বাঙালির শৌর্য, আত্মত্যাগ ও কীর্তি প্রত্যক্ষ না করে এবং না জেনে বেড়ে উঠেছে, তাদের কাছে এ হয়তো অপ্রয়োজনীয় অতীত খনন। তাদের কাছে বর্তমান সময়টি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, ভবিষ্যতের কথা ভাবতে তারা অধিক ইচ্ছুক। তাতে দোষের কিছু দেখি না। কিন্তু অতীত শুধুই অতীত নয়, তা কখনোই স্বয়ম্ভু হয় না, সেই অতীতেরও একটি অতীত থাকে। সুতরাং, অতীত বর্তমানেরই একটি অংশ। অতীত বাদ দিয়ে বর্তমানে উপস্থিত হবো আমরা কী উপায়ে? বর্তমানটিও আগামীকালের মধ্যে মিশে যাবে নিজেকে অতীত করে।

আমাদের যুদ্ধে নিহত-আহত-লাঞ্ছিতদের আপনজনরা কী উপায়ে, কোন জাদুবলে অতীত ভুলতে সক্ষম হবে কেউ কি জানে? সহযোদ্ধা হারানো মুক্তিযোদ্ধা তার শোকগাথা নিয়ে কোথায় যাবে? তার শৌর্যের কাহিনীতে কেউ অনাসক্ত হলেও হতে পারে, কিছু এসে যায় না এবং সেই অসামান্য গৌরব, যা তার জীবনের সর্বোত্তম সঞ্চয়, তা-ও কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় না। সেই সময়ের সর্বশেষ প্রত্যক্ষ সাক্ষীটির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হয়তো সম্পূর্ণ বিস্মৃতি সম্ভব হতে পারে। হয়তো তখনই আমাদের ইতিহাসের এই পর্বটির ইতি ঘটবে।

অতি দ্রুতগামী কোনো যানের যাত্রী বাইরে তাকালে সবুজ শস্যভরা একটি মাঠকে দেখে ভ্রমে আক্রান্ত হয় – বিশাল এক ঝলক সবুজ, উজ্জ্বল একখণ্ড হলুদ মানে শর্ষের ক্ষেত, রুপালির একটি রেখার ঝলক হলো নদী। কোনোকিছু স্পষ্ট ও আলাদা করে দেখা তখন সম্ভব হয় না, কেবল রঙের বিস্তার – কোনোকিছুরই স্পষ্ট কোনো আকার-অবয়ব নেই। সময় এইরকম এক দুর্দান্ত ও আশ্চর্য দ্রুতগামী যান। আমরা, এই সময়ের যাত্রীরা যা-সব অতিক্রম করে যাচ্ছি, তার বেশিরভাগই বড়ো দ্রুত সরে যায় আমাদের দৃষ্টি থেকে, যা দেখা হয় তা মোটা দাগে অনুমান করা একেকটি রঙের বা অবয়বের ধারণামাত্র।

আমি অবশ, অবসন্ন। কবে থেকে শুরু? মনে পড়ে না। এই অবসাদ একসময় চলেও যাবে, জানি। যেতে হবেই। কোথাও কিছু একটা ঘটবে, আমি নিজে ঘটাবো অথবা আর কেউ ঘটিয়ে ফেলবে। আমার স্নায়ু, অনুভব তখন ফিরে আসবে – ওই তো আমি, আমার অস্তিত্ব, আমার পরিচয় – আমি। গ্রীক পুরাণের মহাবিক্রমশালী কুস্তিগীর অ্যান্টেয়াস ততোক্ষণই অপরাজেয় যতোক্ষণ তার পা দুটি মাটি আঁকড়ে থাকবে। কিন্তু হারকিউলিস যখন তাকে মাটি থেকে উপড়ে শূন্যে তুলে ফেলে, সে হয়ে পড়ে নিতান্ত সাধারণ একজন যে-কেউ।

১৩.

কয়েক মাস আগে একটি ভিডিও দেখেছিলাম। এ দেশে যাকে হোম ভিডিও বলে, সেই গোত্রের – একজন মানুষের অত্যন্ত ব্যক্তিগত আত্ম-অনুসন্ধানের সফল ও আনন্দদায়ক পরিণতির ছোট্টো দলিল। কিন্তু সব মিলিয়ে তাতে নিদারুণ এক কাহিনীর আভাস। ঘণ্টাখানেক দৈর্ঘ্যের ভিডিও শুধু পরিণতির ছবিটি দেখায়, সম্পূর্ণ গল্প বলে না। পরে প্রাসঙ্গিক তথ্য, পেছনের গল্পটি জানা হয়।

শুরুতে দেখা যায়, বাংলাদেশের শহুরে মধ্যবিত্ত বাড়ির একটি টেবিলে, সেটি ডাইনিং টেবিল বলে ধারণা হয়, দুটি চেয়ারে বসে আছে দুই নারী। একজন বয়স্ক – চেহারায়, পোশাকে গ্রামীণ মানুষের ছাপ, কথা বলে বগুড়া শহর বা তৎসংলগ্ন অঞ্চলের ভাষায়। এই মুহূর্তে তার বয়স অনুমান করা সম্ভব হয় না, ধারণা করা যায় আনুষঙ্গিক কাহিনীটি জানা হলে। অপরজন বয়সে তরুণী, মাথাভর্তি কোঁকড়া চুলগুলিই প্রথমে চোখে পড়ে। রং-চেহারায় পুরোপুরি বাঙালি ছাপ থাকলেও কথা বলে মার্কিনি ধাঁচের ইংরেজিতে। তার পরনের পোশাকটি অবশ্য কোনো তথ্য জানায় না, আজকাল বাংলাদেশে শহরের অনেক মেয়ে এ ধরনের পোশাক পরে। দুই নারী পরস্পরের ভাষা বোঝে না, তবু তাদের কথোপকথন চলে। একজন মহিলা দোভাষী, যাঁকে ক্যামেরায় দেখা যায় না, একজনের কথা অনুবাদ করে জানাচ্ছেন অন্যজনকে। অবিলম্বে জানা হয়ে যায়, এই ইংরেজি-বলা তরুণীটি ওই বয়স্কার কন্যা।

এদের নাম জানা হয়নি। আমি মনে মনে বয়স্কার নাম দিই আমিনা এবং তরুণীকে সামিনা। তিরিশ বছর পরে দু'জনের এই প্রথম সাক্ষাত। তারা একজন আরেকজনকে ক্রমাগত স্পর্শ করে, অনুভব করার চেষ্টা করে। পরস্পরের অজানা অসম ভাষা তাদের হৃদয়ের যে আর্দ্রতা-ভালোবাসার পূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে পারে না, স্পর্শে তা সঞ্চারিত হতে থাকে। বস্তুত, প্রথমবারের সাক্ষাতে সারাজীবনের বিচ্ছেদ ও অদেখার তৃষ্ণা তবু অপূর্ণ থাকে বলে বোধ হয়। একসময় সামিনা ক্রমাগত চোখের পানি মোছে। মা তাকে বলে, ওঙ্কা কর্‌্যা চোখ মুছপার থাকলে চোখ বিষ করবি রে মা...।

মা ঠিক জানে, তাই তো সে মা। অনূদিত হয়ে কথাটি মেয়ের কাছে পৌঁছুলে কান্নাচোখেই হেসে ফেলে সে, আমার চোখ সত্যিই ব্যথা করছে, মা।

মায়ের মাথায়, কপালে, চুলে, গালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মেয়ে একবার হাসে, পরক্ষণেই ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বলে, এতোদিন পর সত্যি তোমার দেখা পেলাম, মা গো! এই দিনের জন্যে আমি অপেক্ষা করেছি আমার সারাটা জীবন ধরে!

মেয়ের তুলনায় মায়ের আবেগ খানিকটা নিয়ন্ত্রিত মনে হলেও মুহূর্তে তার চোখও ভিজে ওঠে।

আরো খানিকক্ষণ এই ধরনের কথোপকথন চলে। তাদের পরস্পরকে জানা হয় প্রধানত স্পর্শে ও দর্শনে – আনন্দ-বেদনার বিনিময় ঘটে। তারপর দেখা যায়, মা-মেয়েতে মিলে বগুড়ায় গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছে। আমেরিকানিবাসী এই গ্রামেরই কোনোদিন-না-দেখা মেয়েটিকে প্রথমবারের মতো দেখতে মানুষ ভেঙে পড়ে। মায়ের হতদরিদ্র বাড়িঘর – হয়তো বাংলাদেশের বিচারে অতোটা খারাপ নয়, কিন্তু মেয়েটির অনভ্যস্ত চোখে তাই মনে হবে বলে অনুমান হয় – দেখে মেয়ে। দেখে গ্রামের মানুষদের, কোনোদিন না-দেখা একটি ভাইকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে। ভিডিওটি মোটামুটি এইভাবে শেষ হয়।

অনেকগুলি অনিবার্য প্রশ্ন, এই দু'জন নারী, যারা পরস্পরের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত, আলাদা হয়ে গিয়েছিলো কীভাবে? কেন তাদের প্রথম সাক্ষাতের জন্যে তিরিশ বছর অপেক্ষা করতে হলো? ভিডিওতে দু'জনের সাক্ষাতের আবেগার্দ্র মুহূর্তগুলো দেখে কৌতূহল বেড়ে উঠতে থাকে। কাহিনীটি পরে জানা হয়। করুণ ও হৃদয়বিদারক সে গল্প, নিবিড় অনুসন্ধানী এক নারীর জয়ী হওয়ার ইতিবৃত্ত।

তিরিশ বছর আগে আমিনা ছিলো গ্রামে বেড়ে ওঠা সাধারণ কৃষক পরিবারের এক সদ্য-তরুণী। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ পনেরো-ষোলো বছর বয়সী মেয়েদের জন্যে নিরাপদ জায়গা ছিলো না। তাদের গ্রাম আক্রান্ত হয়, পাকিস্তানী উর্দিধারীদের হাতে পড়ে আমিনা। সদ্য-তারুণ্যের স্বপ্ন অবিলম্বে রূপান্তরিত হয় এক দীর্ঘ দুঃস্বপ্নে। যে বয়সে চারদিকের পৃথিবী রঙিন হয়ে থাকার কথা, আমিনার জগৎ সেই সময়ে ঘিরে ফেলে এক নিকষ অন্ধকার। পরবর্তী কয়েকটি মাস তার বদ্ধ পৃথিবীতে কালো ছাড়া আর কোনো রং ছিলো না, যন্ত্রণা ও গ্লানি ছাড়া কোনো অনুভূতি ছিলো না। স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধারা তাকে উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যায়। নিজেকে সে আবিষ্কার করে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায়, তার নাম-ধামও জানা নেই। শুধু বোঝে, জায়গাটি নিজের গ্রাম থেকে অনেকদূরে।

একদিক থেকে হয়তো ভালোই হয়েছিলো, তখন তার ঘরে ফেরা সম্ভবও ছিলো না। শরীরের ভেতরে আরেকজন ক্ষুদ্র মানুষের উপস্থিতির সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ্য। অচেনা জায়গাই তার জন্যে স্বস্তিকর। অল্পদিন পরে একটি মেয়ে ভূমিষ্ঠ হলে শিশুটিকে রেডক্রসের লোকদের হাতে তুলে দিয়ে একসময় আমিনা ফিরে যায় নিজের গ্রামে। মেয়েটির জন্যে তার কোনো অনুভূতি বা ভালোবাসা তৈরি হয়নি, তাকে তো আমিনা ভালোবেসে জন্ম দেয়নি। যে বর্বরতার ফসল হয়ে শিশুটি এসেছিলো, তার জন্যে সুন্দর অনুভূতি তৈরি হওয়ার কোনো সুযোগ ছিলো না! দুঃস্বপ্ন কোনো ভালো অনুভূতি দেয় না।

এতোকিছুর পরেও মানুষের বেঁচে থাকার সহজ প্রবণতাই হয়তো আমিনাকে আবার স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করে। কালক্রমে নিজের গ্রামেই তার বিয়ে হয়, স্বামী-সন্তান নিয়ে সংসার হয়। তবু কখনো কোনো উদাস মুহূর্তে পরিত্যক্ত মেয়েটির কথা কি কখনো তার মনে পড়েনি? কিন্তু কোনোদিন কাউকে বলা যায়নি সে কথা। ভয়াবহ গোপন কাহিনীটি কারো সঙ্গে ভাগ করা যায় না, নিজের মনের গহীনে লুকিয়ে রাখতে হয়।

সামিনাকে সেই শিশুকালেই রেডক্রসের লোকেরা যুদ্ধশিশু হিসেবে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেয়। একটি মার্কিন পরিবার তাকে দত্তক নেয়। বোধ-বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে দত্তক নেওয়া পরিবারেরই একজন হিসেবে নিজেকে জেনে এসেছে সে। বড়ো হয়ে একসময় নিষ্ঠুর সত্যটি জেনেছে – সে আসলে যুদ্ধশিশু। তখন থেকে তার অনুসন্ধানের শুরু। সে বুঝে যায়, পৈত্রিক পরিচয় কোনোদিনই আর উদ্ধার করা যাবে না, কিন্তু মায়ের সন্ধানে সে অক্লান্ত, একাগ্র হয়ে থাকে। বহু বছরের অনুসন্ধানের পর তার মায়ের পরিচয় ও গ্রামের নামটি সে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। রেডক্রসের কাগজপত্র ঘেঁটে নিশ্চিত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রনিবাসী বাংলাদেশের এক বন্ধুর মাধ্যমে সে আমিনার কাছে এই মর্মে খবর পাঠায় যে, হারিয়ে যাওয়া মেয়েটি তার সাক্ষাৎপ্রার্থী। আমিনা কোনো উৎসাহ দেখায় না, কোনো কথা বলতে আগ্রহী নয় সে, ব্যাপারটিকে সত্যি বলে স্বীকারও করে না।

আমিনার মৌখিক অস্বীকারের যুক্তি বোঝা দুরূহ নয়। যে সত্য এতো বছর ধরে সে আড়ালে রেখে এসেছে, স্বামী-সন্তান-সংসারের বাস্তব পৃথিবীতে যে সত্যের কোনো অস্তিত্ব এতোদিন ছিলো না – সেই সত্য যাবতীয় অন্ধকার ও দুঃখস্মৃতিসহ এখন সামনে এসে উপস্থিত হলে তাকে মেনে নেওয়া সহজ নয়।

তার সমস্ত পৃথিবী যে ওলটপালট হয়ে যাবে! জানাজানি হলে মানুষের কাছে মুখ দেখাবে সে কী করে? আরো কঠিন কথা, যে মেয়েকে জন্মের পরেই সে পরিত্যাগ করেছে, নিজের সন্তান বলে স্বীকৃতি দেয়নি মনে মনেও, মায়ের পরিচয়ে তার সামনে দাঁড়াবে কোন দাবিতে?

এই দোটানারও একদিন সমাপ্তি ঘটে। সামিনা আরো কয়েকবার চেষ্টা করেও আমিনার মন গলাতে সক্ষম হয় না। শেষমেশ সামিনা খবর পাঠায়, সে বাংলাদেশে আসছে এবং নিজে মায়ের সামনে দাঁড়াবে। তখন দেখবে, কেমন করে মা তাকে অস্বীকার করে, ফিরিয়ে দেয়!

আমিনার তখন সত্যের মুখোমুখি না হয়ে আর উপায় থাকে না। বুকভরা আকুতি ও চোখভরা জল নিয়ে সে ঢাকায় আসে মেয়ের সঙ্গে মিলিত হতে। তিরিশ বছর পর।

তার আগে এই লুকিয়ে রাখা কাহিনীটি স্বয়ং আমিনাকেই উন্মোচন করতে হয় স্বামী ও পুত্রের কাছে। গ্রামের প্রতিবেশী ও আত্মীয়-পরিজনের কাছে। বিস্মিত হয়ে সে দেখে, তার আশঙ্কা কিছুমাত্র সত্যি হয়নি। তার চেনা পৃথিবী উল্টে যায়নি। কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন করেনি, অভিযোগের আঙুল তার দিকে তোলেনি, কলঙ্কের ছবিও কেউ আঁকতে বসেনি। বরং ভালোবাসা, সহানুভূতি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। আমিনা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে, মানুষ আজও মানুষ আছে। গ্রামের বয়স্কদের মনে সেই সময়ের স্মৃতি এখনো খুবই জাগ্রত। তারা জানে, মানুষের মতো দেখতে একদল অমানুষ আমিনাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলো, কিন্তু তাতে সে কিছুমাত্র অপবিত্র হয়নি। সেই মানুষেরা আরো জানে, সামিনার জন্মের ইতিহাসটি তার নিজের রচিত নয়, সেই ইতিবৃত্ত রচনায় তার কোনো ভূমিকা ছিলো না। যে মানুষটি আমিনার স্বামী, সামিনাকে সে আপন কন্যার স্নেহ দিতে কার্পণ্য করে না, এবং তার পুত্র – সম্পর্কে সামিনার সৎভাই – সামিনাকে বোন বলে জড়িয়ে ধরে। দুই ভাইবোনে গলা জড়াজড়ি করে কাঁদে।

সামিনা ও আমিনার প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তটিতে ভিডিওর শুরু। বেদনাময় মধুর তার পরিসমাপ্তি।

যুদ্ধ, বিপ্লব বদলে দেয় রাষ্ট্র ও সমাজ, তা হয় ইতিহাসের উপকরণ। তার প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তিমানুষের জীবন পাল্টে যায়, যুদ্ধের হিংস্র ও দয়াহীন নখর গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত রেখে যায় কতোশত মানুষের জীবনে – তারই একটি অসামান্য গল্প-দলিল এই ভিডিও। এই দলিল ইতিহাস বটে, তবে তা ব্যক্তিগত। কেতাবী ইতিহাস ব্যক্তিমানুষের জীবন বা তার অনুভবের কারবারী তো নয়!

১৪.

মাঠে ক্রিকেট চলছে। বাংলাদেশ টেস্ট খেলছে তিন বছর ধরে, তাতে প্রথম জয়ের মুখ এখনো দেখা হয়নি। দশটি টেস্ট ক্রিকেট খেলুড়ে দেশের মধ্যে কনিষ্ঠতম এবং শক্তিতে সবার চেয়ে দুর্বল। তা হোক, তবু তা আমার দল, হারতে হারতেই একদিন ঠিক উঠে দাঁড়াবে।

আমার দেশটি হয়তো খেলছে পার্থ অথবা মুলতান, কিংবা ব্রিজটাউনে। খেলা যেখানেই হোক, একটি দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড় বাংলা ভাষায় কথা বলে, ভাবতেও কী অহংকার! আগে তো কখনো ছিলো না! গায়ে কাঁটা দেয়। এবারে খেলাটি বাংলাদেশেই, ভারতের সঙ্গে। এই টেস্টে প্রতিপক্ষেরও একজন, অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি, বাংলাভাষী। একটি ক্রিকেট ম্যাচে বাইশজন খেলোয়াড়ের বারোজনই বাংলাভাষী। ভাবা যায়! ক্রিকেটের ইতিহাসে এই ঘটনা অভিনব। ক্রিকেটের পরিসংখ্যান বইয়ে অবশ্য এই তথ্য জায়গা পায়নি। পাওয়া উচিত নয়?

খেলা চট্টগ্রামে। দেশে থাকলে চট্টগ্রাম গিয়ে মাঠে বসে চাক্ষুষ দেখা অসম্ভব হতো না। এখানে আর কী করে দেখবো? এ দেশে ক্রিকেট খেলা দূরে থাক, জিনিসটা কী তা-ই কেউ জানে না। এরা ক্রিকেট বলতে ওই নামের পোকাটিকেই বোঝে। এখানে টিভির স্পোর্টস চ্যানেলগুলো জগতের যাবতীয় খেলা দেখায়, এমনকী গলফের জন্যে আলাদা চ্যানেল। অথচ ক্রিকেট নেই। দর্শক নেই বলে বাজার নেই, সুতরাং বাণিজ্যের সম্ভাবনাও শূন্য। পুঁজির মালিকরা বাণিজ্য চায়। স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলিতে ক্রিকেট দেখা যায় খেলাপ্রতি টাকা দিয়ে। এ দেশে বসবাস করা উৎসাহী ভারতীয় ও পাকিস্তানীরা চাঁদা তুলে দলবদ্ধ হয়ে খেলা দেখে, কিন্তু বাঙালি নিজেদের ক্রিকেট নিয়ে তেমন উৎসাহী নয়। বাংলাদেশের ক্রিকেট রাত জেগে দেখার মতো প্রেম এখনো কারো জন্মায়নি। হবে কোনো একদিন। কবে?

ভাবতে লজ্জা করে, বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ ক্রিকেটে পাকিস্তানের সমর্থক। দেশে কী অবস্থা আমার সঠিক জানা নেই, কিন্তু এ দেশে এরকমই দেখি। এমনকি, ৯৯ সালে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের এক ম্যাচে পাকিস্তান বাংলাদেশের কাছে পরাজিত হলে অনেককে বলতে শুনেছি, পাকিস্তান ইচ্ছে করে হেরেছে। কেউ বলেছে, বাংলাদেশকে টেস্ট ক্রিকেটে অন্তর্ভুক্ত করানোর জন্যে পাকিস্তান ম্যাচটি ইচ্ছে করে ছেড়ে দিয়েছে। কী আশ্চর্য! ক্রিকেটে হোক আমাদের সামর্থ্য অল্প, কিন্তু পাকিস্তানকে এক-আধবার হারানোর সামর্থ্য আমাদের যে আছে, তা-ও মানতে পারবো না? নির্লজ্জ আত্ম-অবমাননার এর চেয়ে বড়ো উদাহরণ আর কী হয়!

আমার স্যাটেলাইট টিভির সংযোগ নেই। একা মানুষ আমি, ঘরে থাকাই কম হয়, টিভি দেখাও বড়ো একটা হয় না। আমার ভরসা ইন্টারনেট। গোটা তিনেক ক্রিকেট ওয়েবসাইট খুঁজে পেয়েছি, সেখানে ধারাভাষ্য পাওয়া যায় না, কিন্তু সচল স্কোরবোর্ড আছে। মিনিটে মিনিটে আপডেট, একটিতে প্রতি বলের আপডেটও পাওয়া যায়।

রাত জেগে স্কোর দেখছিলাম। আগের টেস্টে গো-হারা হেরেছিলো বাংলাদেশ – এক ইনিংস ও ১৪০ রানে। এই ম্যাচটিও হারবে মনে হচ্ছে। প্রথম ইনিংসে দ্রাবিড় আর গম্ভীরের সেঞ্চুরিসহ ভারত ৫৪০ রানের পাহাড় বানিয়ে রেখেছে। একেবারে অলৌকিক কিছু না হলে এই ম্যাচ বাঁচানো একরকম অসম্ভব।

বাংলাদেশের ব্যাটিং সামর্থ্য নিয়ে খুব ভরসা করা চলে না। আজ তৃতীয় দিনের পুরোটা আগলে রাখতে পারলে ড্র করার একটা সম্ভাবনা অবশ্য তৈরি হয়। হবে কি? না হোক, হারলে হারবে, ভারতের মতো অভিজ্ঞ ও ভালো টীমের কাছে পরাজয়ে লজ্জা কিছু নেই। কিন্তু আমার দলটি অন্তত লড়াই করে হারুক, এইটুকুই আমার চাওয়া।

খেলা শুরু হতে হতে রাত এগারোটা। সকালে অফিসে যাওয়ার তাড়া আছে, দেরি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে লড়াই করার চিহ্নগুলো দেখতে পাচ্ছি, জেগে বসে থাকি সেটি দেখার আশায়। ৫৪০-এর জবাবে বাংলাদেশের আগের দিন শেষ হয়েছিলো তিন উইকেটে ৫৪ করে। শুরুটি ভালো হয়নি, কিন্তু আজ সকাল থেকেই আশরাফুল ছেলেটি বুঝিয়ে দিচ্ছে লড়াই সে করবে।

বাংলাদেশ আজ পর্যন্ত টেস্ট জেতেনি, কিন্তু এই ছেলেটি তিন বছর আগে ক্রিকেট রেকর্ডবুকে জায়গা করে নিয়েছে কনিষ্ঠতম সেঞ্চুরিয়ান হিসেবে, জীবনের প্রথম টেস্টে। তখন তার বয়স ১৭। আশরাফুল নামটি একটু অদল-বদল করে তার নাম দেওয়া হয়েছিলো আশার ফুল! আঃ, তাই যেন হয়। আজ সে আবার আশার ফুল হয়ে ফোটার লক্ষণ দেখাচ্ছে। সাত সকালেই সে জাহির খানের দ্রুতগামী বলে একটি ছক্কা মেরে বসে। চোখে দেখা হচ্ছে না, ধারাভাষ্যও শোনার উপায় নেই, কিন্তু মনে মনে ধারাভাষ্যকারকে বলতে শুনি, আ টাওয়ারিং সিক্স! বাশারের সঙ্গে জুটি বেঁধে সে তোলে ৭০ রান। বাশারের প্রস্থানের পরে তার সঙ্গী আফতাব, আরেক তরুণ-তুর্কী। সে আর আশরাফুল ১৫৬ বলে যোগ করে আরো ১১৫। সাবাশ! এই তো চাই!

লাঞ্চের বিরতি হলো, তখন আশরাফুলের নিজস্ব সংগ্রহ ৬২। আবার খেলা শুরু হলে তার ব্যাট আগুন ঝরায়। বলা যায়, আশার ফুলগুলি ফুটে উঠতে থাকে। ১৮টি বল পরে তার রান ৭৬। উত্তেজনায় আমার স্নায়ু টান টান হয়ে থাকে, সেঞ্চুরি পাবে কি সে? পেয়ে যায় সে স্বপ্নের সেঞ্চুরি – পরম দুঃসাহসে উদ্ধত বালক ৭টি মাত্র বল খেলে ২৪ রান যোগ করে নেয়। ইরফান পাঠানকে পরপর তিনটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৮৮। ৯২-এ পৌঁছে হরভজন সিংকে চার। ঠিক তার পরের বলেই আরেকটি। স্বপ্নসম্ভবের শতরান। ধারাভাষ্যকার তখন নিশ্চয়ই বলছেন, ব্রিলিয়ান্ট! ম্যাগনিফিসেন্ট!

আঃ, এই সাহস আর বীরত্বও ধরে বাঙালি!

হয়তো কিছুই নয়, তবু গর্ব হয়, কোন চোরা আনন্দে চোখের কোল ভিজে ওঠে। আমার অপ্রাপ্তির দেশের জন্যে এই তো কতো বড়ো পাওয়া! কিছু না থাক, অহংকার করার মতো ছিটেফোঁটা একটি-দুটি লড়াইয়ের সামর্থ্য দেখতে চাই। আপাতত এর চেয়ে বেশি আর কিছু চাওয়ার নেই।

রাত সাড়ে তিনটা। ঘুমাতে যাওয়া দরকার। বিছানায় শুয়েও টের পাই, শরীরের সমস্ত তন্ত্রী তখনো গর্বে ও উত্তেজনায় সজাগ। জয়ের গৌরব এই টেস্টে হবে না, জানা কথা। না হোক, আমার অহংকারে কোনো ঘাটতি তাতে হবে না। আমার দেশ মাথা তুলতে শুরু করেছে, লড়াই করতে শিখছে। এইভাবে একদিন বুক ফুলিয়ে বলার মতো কিছু একটা তারা ঘটিয়ে ফেলবে। অপেক্ষায় থাকবো। ততোদিন এইসব ছোটো ছোটো গৌরবগাথা আমার ভেতরে সঞ্চিত হতে থাক, আমি লুকিয়ে রাখবো পরম যত্নে ও নিঃশর্ত মমতায়।

১৫.

জীবনের অর্ধেকের বেশিকাল যে দেশে অতিবাহিত হলো, তা আমার দেশ নয়। হবে না কোনোদিন। নিশ্চিত জানি বলে হয়তো এই বিষয়ে আমি কিছু বেশি অনুভূতিপ্রবণ। প্রতিদিনই কোনো না কোনো একটি অনুষঙ্গ পেয়ে যাই যখন অনিবার্যভাবে মনে পড়ে যাবে, আমি এখানকার কেউ নই। অনেকদিন আগে একবার আমাদের অফিসে সিকিউরিটি অ্যালার্ম বসানোর জন্যে লোকজন এসেছে। দলনেতা লোকটি আমার টেবিলে বসে, কথায় কথায় একসময় বলে, তুমি দেখছি বেশ ভালো ইংরেজি বলো!

তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে, তাই তো, আমার কি ইংরেজি বলার কথা! কী অসম্ভব ব্যাপার! এখানকার কেউ তো নই আমি!

লোকটি হয়তো কিছু ভেবে বলেনি, তার মন্তব্যটিকে প্রশংসাসূচকভাবে নেওয়ারও সুযোগ ছিলো, হয়তো তাই সে বোঝাতে চেয়েছে। অথচ আমার মনে হয়েছিলো, কথাটির গূঢ় অর্থ আসলে এইরকম : তোমার এখানে কী চাই বাবা, কী করে কোত্থেকে এসে জুটলে তুমি, বলো তো? হিন্দি অনুবাদে *মেরে আঙ্গনে মে তুমহারা কেয়া কাম হ্যায়!*

এ দেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্যে মানুষের আকুতির শেষ নেই। শুধু বাংলাদেশের নয়, পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ যারা এখানে আসে, মার্কিন নাগরিকত্ব লাভ করাকে তারা পরম সৌভাগ্য ও মোক্ষ জ্ঞান করে থাকে। দোষের কিছু আছে বলে মনে করি না, যারা পারে তারা পারে। আমি পারিনি, নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে পেরে উঠবো এমন ভরসা নেই। আসলে বোঝাপড়াটি করতেই অনিচ্ছুক আমি। আইনসম্মতভাবে এখানে থাকার জন্যে যতোটুকু না হলে নয়, তার বেশি কিছু আমার দরকারি মনে হয়নি। গাঢ় নীল রঙের মার্কিন পাসপোর্ট না হলে আমার কী আসে যায়? পরের দেশে আমার ভোটাধিকার দিয়ে আমি কী করবো? নাগরিকত্ব নিতে গেলে এ দেশের জন্যে নিঃশর্ত আনুগত্যের শপথ করতে হয়। তা কী করে সম্ভব বুঝতে পারি না। আমার সবুজ পাসপোর্টটি, যদিও আমার কোথাও যাওয়ার কথা নেই এবং এই পাসপোর্ট পৃথিবীর অনেক জায়গায়ই আজকাল দুর্ভোগের কারণ হচ্ছে শুনতে পাই, তবু সময়মতো আজও নবায়ন করিয়ে আনি।

চিলির কন্যা ইসাবেল আলেন্দে আমেরকিায় বসে উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকা মিলিয়ে কল্পনায় একটি দেশ বানিয়ে তাকে ইনভেনটেড কান্ট্রি নাম দিয়েছেন। আমার হয়নি। হবে না।

স্কুলে ছোটো ক্লাসে পড়ার সময় কোনো উর্দু ছবির একটি সংলাপ মানুষের মুখে খুব শুনতাম – *আফসোস, ম্যায় আমরিকা মে পয়দা নেহি হুয়া!* তখন ভালো করে বোঝার বয়স হয়নি, পরে ভাবলে মনে হতো, ঠাট্টার ছলেও কি এ কথা বলা চলে! একজন পাকিস্তানি আমেরিকায় জন্মায়নি বলে আক্ষেপ করলে তার দাস্য মনোবৃত্তিটিই প্রকাশ পায়। অথচ উল্টোদিকে প্রায় একই সময়ে ভারতীয় হিন্দি ছবির একটি জনপ্রিয় গান ছিলো, *মেরা জুতা হ্যায় জাপানি, ইয়ে পাৎলুন ইংলিস্তানি, শ্যরপে লাল টোপি রুশি, ফিরভি দিল হ্যায় হিন্দুস্তানি...*। জাপানের পাদুকা, বৃটিশ পরিধেয়, রুশ টুপি হলে কী হয়, আমার হৃদয়টি কিন্তু ভারতীয়। হৃদয়টিকে শুদ্ধ ও একাগ্র রাখাই জরুরি।

এ দেশে আমি বাস করি দীর্ঘকাল ধরে অথচ তার জন্যে আমার কোনো টান নেই, তার ভালোমন্দে আমার কিছু এসে যায় না – এ-ও হয়তো এক ধরনের প্রবঞ্চনা। একটু কঠিনভাবে বললে, ভণ্ডামি। কিন্তু কোথায় যাবো আমি?

সোভিয়েট ইউনিয়ন ষাটের দশকের শেষভাগে চেকোশ্লাভাকিয়া দখল করে নিলে কমিউনিস্টবিরোধী চেকরা দলে দলে দেশান্তরী হতে শুরু করে। দেশত্যাগে ইচ্ছুক এইরকম একজন গেছেন সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে, যেখানে আবেদনকারীদের পছন্দের দেশে ভিসার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। আবেদনকারীকে সরকারি অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোন দেশে যেতে চান?

উত্তরে আবেদনকারী বললেন, তা তো জানি না। তবে এমন কোথাও যেতে চাই যেখানে একটু শান্তি ও স্বস্তি নিয়ে বাস করতে পারি।

সরকারি অফিসার একটি গ্লোব ধরিয়ে দিলেন আবেদনকারীর হাতে। বললেন, দেখেশুনে একটা দেশ ঠিক করে নিন।

আবেদনকারী অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গ্লোবটি দেখলেন। তারপর সেটি ফিরিয়ে দিয়ে সরকারি কর্মচারিটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কাছে আর কোনো গ্লোব আছে?

১৬.

The war is over, if you want it...

১৯৭২-এর জানুয়ারি। শান্তাহার থেকে ট্রেনে উঠবো, নিজের শহরে ফিরছি। দেখি ট্রেনের গায়ে পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ে মুছে আলকাতরা দিয়ে হাতে লেখা হয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। সেই প্রথম প্রকাশ্যে বাংলাদেশ নামটি উৎকীর্ণ দেখি। অপটু হাতে লেখা, তবু কী রোমাঞ্চ, কী স্পর্ধিত গৌরব! বিহারী-অধ্যুষিত এলাকা শান্তাহার, পাকিস্তানীদের সহযোগী হওয়ার অপরাধে তাদের অনেকে নিহত – কেউ কেউ অন্যায়ভাবেও – অবশিষ্টরা পলাতক। বাড়ি বাড়ি উড্ডীন সোনালি রঙে বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত নতুন পতাকা। আগের বছর তেইশে মার্চে সারাদেশে উড়েছিলো এই পতাকা, অবশ্য তা আবার নামিয়ে ফেলতে হয়েছিলো পঁচিশে মার্চের পর। এখন আর এই পতাকা কোনোদিন নামাতে হবে না। যে জাতি এতো সহ্য করতে পারে, এতো শৌর্য ধারণ করে – তাদের আর ভয় কী?

পরদিন সকালে বেরোতেই বুধা চাচার মুখোমুখি। শশ্রুমণ্ডিত মলিন মুখ, ধীর পায়ে হাঁটেন। পাড়ার গলির শেষ মাথায় তাঁর দোকান, বোধহয় সেখানেই যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ান। এক মুহূর্তমাত্র। তারপরই ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠেন, বাদশা, আলতাফ আলীক অরা মারিছে, বা' রে...

বাদশা-আলতাফ আলী সম্পর্কে চাচাতো ভাই, ছোটোবেলা থেকে একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি আমরা, এক মাঠে খেলেছি। তাদেরসহ মোট চোদ্দোজনকে তুলে নিয়ে গুলি করে মারা হয়েছিলো, আগেই শুনেছি। এই দলে আমার স্কুলের সহপাঠী সাইফুলও ছিলো। তখন রোজার সময়। মানুষজন সেহরি খেয়ে সবেমাত্র চোখ মুদেছে, এই সময় পাড়া ঘেরাও করে যুবাবয়সী ছেলেদের ছেঁকে তুলে আনা হয়, ফজরের আজান হওয়ার আগেই গাদাগাদি করে মিলিটারি ভ্যান তাদের নিয়ে যায়। তাদের লাশ পরে পাওয়া যায় শহরের কয়েক মাইল দূরের এক গ্রামের পুকুরপাড়ে, সেখানেই তারা এখনো শায়িত।

বুধা চাচাকে বলার মতো কোনো কথা মুখে আসে না। কী বলা সম্ভব পুত্রশোকগ্রস্ত পিতাকে? পুত্র যদি হতো রোগগ্রস্ত, মৃত্যু হওয়ার মতো উপযুক্ত বয়স্ক হতো, তাহলে হয়তো কিছু সান্ত্বনা পাওয়ার অজুহাত পাওয়া সম্ভব। পাকিস্তানীদের অপছন্দের কাজে লিপ্ত হলেও, যেমন হয়েছিলো সাইফুল, কতকটা বোঝা যেতো। কিন্তু নিরস্ত্র-নির্বিরোধ পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের নির্মম হত্যাকাণ্ড, তরুণ বয়সী হওয়াই যাদের একমাত্র অপরাধ ছিলো, কীভাবে অর্থবোধক হয়? কী সান্ত্বনা আছে তার? সাইফুল ঘরে বসে মলোটোভ ককটেল তৈরি করে মুক্তিযোদ্ধাদের সরবরাহ করতো, এই অপরাধে যুদ্ধের শুরুর দিকেই ধরা পড়ে। তাকে নাটোর জেলে রাখা হয়েছিলো মাস দুয়েক, তারপর হয়তো কিছু অলৌকিক উপায়েই ছাড়া পেয়ে ঘরে ফিরে আসে এবং নির্দোষ দিনযাপন করতে থাকে। সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে তাকে ফিরে পেয়ে তার বাবা-মা কৃতজ্ঞবোধ করেন, গরু জবাই করে কাঙালিভোজন করান। অতি সামান্য সময়ের ব্যবধানে সেই সাইফুলকেই আবার ধরে নিয়ে যাওয়া হলে সেই তার শেষ যাওয়া হয়। সাইফুলের বড়ো বোন হাসনা আপা থাকেন আমাদের একটি বাড়ি পরেই। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে কী বলবো?

আমি যুদ্ধে ছিলাম এবং তারপরেও জীবিত, এই বোধ কিয়ৎক্ষণের জন্যে বুধা চাচার সামনে আমাকে অপরাধী করে। বাদশা-আলতাফরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকেও বাঁচতে পারেনি।

দু'জনে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে নিঃশব্দে কথা বলি, পরে বাসায় দেখা করতে আসবো বলে আর্দ্র চোখে বিদায় নিই।

আমার ছোটো শহরটির পথে পথে একা হাঁটি। চেনা অনেক বাড়িঘর বদলে গেছে আগুনের পোড়া চিহ্ন নিয়ে। কোনো বাড়ির দেওয়ালে গুলির চিহ্ন, গোলার আঘাতে ভেঙে পড়া দালান, বসতবাড়ি। এইসব বাড়িঘরের অনেক বাসিন্দা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, ফিরবে না কোনোদিন। কারো কারো কথা আমি এরই মধ্যে জানি, আরো অনেক বেশি জানি না বলে আশংকা হয়।

মালতীনগরে জাফরদের বাড়ির সামনে দাঁড়াই। স্কুলজীবন থেকে তার সঙ্গে একত্রে ঘোরাফেরা, এই বাসার পাশে করতোয়ার পাড়ে খসরু-শ্যামলেন্দু-নিরু-মতিন-হেলালসহ বিকেলের আড্ডা। একতলা বাড়িটিকে এমন অক্ষত দেখবো ভাবিনি, জাফরের বড়ো ভাই আমানউল্লাহ খান আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাদের একজন। পঁচিশে মার্চের পর জাফরের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

বরাবরের মতো ঘোরানো বারান্দার একপাশে বসার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকি, জাফর!

কোনো সাড়া নেই। বারান্দার দিকের জানালাগুলো সব ভেতর থেকে বন্ধ। এবার সদর দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ি। কেউ খোলে না, ভেতরে কেউ আছে কিনা তা-ও বোঝার উপায় নেই। সামান্য ধাক্কা দিতে দরজা খুলে যায়। জাফরের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ভেতরে ঢুকি। কোথাও কোনো জনপ্রাণীর সাড়া নেই। উঠানে বড়ো বড়ো ঘাস, ঝোপজঙ্গলে আকীর্ণ। বারান্দায় ধূলা জমে আছে, এক কোণে একটি ভাঙা চেয়ার ওল্টানো। ভেতরের সবগুলো ঘরের দরজা-জানালা খোলা, একটু লক্ষ্য করে দেখা যায় সেগুলো নেই, খুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাড়িময় গা ছমছম করা নিস্তব্ধতা। ঘরের ভেতরে উঁকি দিই, কোথাও কোনো আসবাব নেই, কিছুই নেই। এ বাড়িতে মানুষের বসতি কোনোকালে ছিলো, মনেও হয় না। এই শূন্যতার ভেতরেও কী আশায় কে জানে, জাফরের নাম ধরে ডাকি। কে আর উত্তর দেবে!

শ্যামলেন্দুদের বাড়িতে একটি পুরনো গ্রামোফোন ছিলো। একাত্তরের মার্চ মাসে কয়েকটি রেকর্ডসহ গ্রামোফোনটি আমাদের বাড়িতে কয়েকদিনের জন্যে ধার করে আনা হয়। একই সময়ে খসরু আমাদের বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছিলো *গীতবিতান*।

শ্যামলেন্দুর কাছ থেকে আনা একটি রেকর্ড তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, *তোলপাড় তোলপাড় মনের কথা* গানটির *খুঁজে পাই না তারে* কলিটির জায়গায় রেকর্ড কাটা – ক্রমাগত শুনতাম *খুঁজে পাই, খুঁজে পাই, খুঁজে পাই...*

গ্রামোফোনটি সময়মতো ফিরিয়ে দেওয়া হয়ে ওঠেনি, যুদ্ধের পুরোটা সময় তা আমাদের বাড়িতেই থেকে যায়। যুদ্ধশেষে শ্যামলেন্দুর খোঁজে যাই। শোনা যায়, তারা সপরিবারে ভারতে চলে গেছে যুদ্ধের শুরুতে, আর ফিরবে না। আমার ভেতরে কাটা রেকর্ডে তখন ক্রমাগত বেজে যায়, *খুঁজে পাই না তারে, খুঁজে পাই না তারে, খুঁজে পাই না তারে...*

খসরু গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছিলো। যুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েক মাস পরে শহরে ফিরে এলে তাকে দেখে আমরা চমকে উঠি। আমরা কেউ জানতে পারিনি সে নিশ্চিত মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এসেছে।

মিলিটারিরা একদিন তাদের গ্রাম ঘেরাও করে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায় – খসরুকে তার মা ও আরো কিছু আত্মীয়-পরিজনসহ সেই সারিতে দাঁড়াতে হয়। পাখি মারার কায়দায় তাদের লক্ষ্য করে পাকিস্তানী সেনারা গুলি চালায় । অন্যদের মতো খসরুও মাটিতে পড়ে যায়, কী অলৌকিক উপায়ে কে জানে, তার শরীরে একটিও গুলি লাগেনি! তখনো জানে না সে অক্ষত। মিলিটারি ও রাজাকাররা সমবেত উল্লাসে লুটপাট সম্পন্ন করে বাড়িঘরগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে বিজয়ীর ভঙ্গিতে চলে যায়। চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেলে সারিবদ্ধ মৃতদেহের মধ্যে খসরু উঠে বসে। মায়ের একটি হাত তখনো তার হাতে ধরা। চারদিকে স্বজনদের সারিবদ্ধ মৃতদেহের মাঝখানে খসরু স্তব্ধ হয়ে পাথরের মতো একা বসে থাকে।

গীতবিতান ফিরিয়ে দিয়ে খসরু জানায়, মিলিটারিরা তার ঘরে ঢুকে দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখে ছবিটি কোনো আউলিয়া-দরবেশের হবে ভেবে সালাম দেয়। অন্য বইপত্রের সঙ্গে গীতবিতানটি ঘরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। বাড়িঘর আগুনে পুড়ে গেলেও গীতবিতান রক্ষা পায়, ক্ষয়ক্ষতি বলতে ধুলোমাটি লেগে থাকা বইটির বাঁধাই কিছু আলগা হয়ে গিয়েছিলো।

১৭.

আমার তো ঘর নেই, আছে ঘরের দিকে যাওয়া...

প্লেনের একটানা গোঁ গোঁ আওয়াজ কী একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর! এই যাত্রার যেন আর শেষ নেই। তা হোক, আমার স্নায়ু সজাগ ও সতেজ, অনুভূতি তীক্ষ্ণ ও একমুখী। একসময় অদৃশ্য পাইলটের কণ্ঠস্বর শোনা যায় – আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণের ঘোষণা। এতোকাল পরে দেশে ফেরার উত্তেজনা ও উদ্বেগ আমার স্নায়ুসমূহ আর সহ্য করতে পারে না। কম্পমান আমার উদ্বেল হৃদয়, আমার সমস্ত শরীর। এই রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরের আকাশে ভাসমান মেঘের ভেতর থেকে বিমান ক্রমশ নামতে থাকলে চোখ ভরে আমার দেশের ঘন সবুজ গাছপালা দেখি। এতো ওপর থেকে ঘনবদ্ধ সবুজকে বিশাল ও মনোহর এক অরণ্যের বিস্তার বলে ভ্রম হয়। এখনো বাড়িঘর দৃশ্যমান নয়। একটি নদী চোখে পড়ে, কোন নদী এটি? জানার প্রয়োজন নেই। এই আমার দেশ, এই প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তটির জন্যে কতোকাল অপেক্ষা করে আছি! মনে মনে দেখি, বিমানবন্দরে মুনিয়া আমার অপেক্ষায়। কিন্তু তা কী করে সম্ভব? তবু ভাবতে দোষ নেই। অকস্মাৎ অনুভব করি, মুনিয়ার মুখচ্ছবি আমার স্মরণে নেই। কিছুতেই মনে পড়ে না তার চোখগুলি কেমন, কীরকম তার ভুরুর ভঙ্গিমা। হাতের আঙুলগুলো তার কেমন ছিলো? চিবুক? কোঁকড়া চুল ছিলো কী তার? মাঝখানে সিঁথি, নাকি একপাশে? মনে পড়ে না, স্মরণে আসে না কিছুই। কী আশ্চর্য, যে নারীকে আমার এতো কাছের মানুষ ভেবে এসেছি, তার মুখ মনে নেই, তাই হয়? আবার ভাবি, মনে থাকলেই বা কী হতো? যে মুনিয়াকে আমি সেই কোন সুদূরকালে দেখেছি, এখন কী আর সে সেই মুনিয়া আছে? থাকে না, কেউ তেমন থাকতে পারে না। আমিও কি আজ আর সেই আমি? ভেতরে ভেতরে মানুষ অপরিবর্তনীয় থাকতে পারে, বহিরঙ্গে থাকে না। আমার মাথাভরা ঝাঁকড়া চুল মুনিয়ার প্রিয় ছিলো, আপনা থেকে বাড়তে দেওয়া যে চুলগুলোকে আমার ব্যক্তিত্বের খুব দরকারি অংশ ভাবতাম এককালে এবং এক সৈনিকের আদেশে যে চুল হারিয়ে তীব্র অপমানের জ্বালায় দগ্ধ হয়েছিলাম একদা – সেই চুলের কতোটুকু আর অবশিষ্ট আছে আজ? আসমান ছেলেটির ঘোষণা মানলে আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমার কতো চুল পাকা! তবু জানি, অপেক্ষমান মুনিয়াকে দেখামাত্র চিনে নিতে পারবো। মুনিয়া কি চিনবে আমাকে? কে জানে! ভাবি, এতো বছর পরে আমার দেশেরই বা কতোটুকু আমার চেনা? ঢাকা শহরকে কি চিনতে পারবো? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়? কলা ভবন? অথবা সূর্যসেন হল? সুরুজ মিয়া কি এখনো আছে? ইন্টারনেটে ঢাকার কাগজ পড়ে জানি, এই শহরে নতুন অনেক রাস্তা হয়েছে, মানুষ বেড়েছে কয়েকগুণ, রাস্তায় সারিবদ্ধ গাড়ির বাহার, ঝকঝকে আলো ঝলমল শপিং সেন্টার, নতুন নতুন উঁচু সব ইমারতের সারি। হয়তো মনে হবে, কোথায় এসেছি আমি! অবতরণের চূড়ান্ত মুহূর্তে আমার হৃৎস্পন্দন অদম্য হয়ে ওঠে, বুকের ভেতরের হাতুড়ির আওয়াজ প্লেনের শব্দকেও চাপা দিয়ে দিচ্ছে, সহযাত্রীরা সবাই তা শুনতে পাচ্ছে বলে মনে হয়। অবতরণ সম্পন্ন হলে প্লেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি। আমি দেশ ছাড়ার সময় বিমানবন্দর ছিলো তেজগাঁয়, এটি আগে দেখিনি। বাইরে এসে মুনিয়াকে না দেখে আশ্চর্য হই না। জানতামই তো, সে থাকবে না। আর কোনো চেনামুখও নেই। থাকার কথা নয়। হঠাৎ দেখি চন্দ্রালোকিত হেমন্তরাতে পাঁচজন সশস্ত্র যুবক নদীর ঘাটে বাঁধা নৌকার

দিকে হাঁটে। নৌকায় মুনিয়া আগেই উঠে বসে আছে। কোথা থেকে এলো সে? কিন্তু এতো চাঁদের আলোতেও তার মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। তেঁতুলতলার বিশাল গাছটি অবিকল আছে দেখি, মৃদু হাওয়ায় তার ঝিরঝিরে পাতাগুলি নড়ে। আমার পিতা কুয়াশাময় শীতসকালে প্রাতঃভ্রমণে যাচ্ছেন – অবিকল আগের ছবি, এতো বছরেও কিছুমাত্র মলিনতা নেই। মনে হয়, আমার বালক বয়সটি যেন অকস্মাৎ ফিরে এলো। শীর্ণ নলামারার পানির ওপরে কুয়াশা এখনো ঘুরপাক খায়, নদীর ওপার কুয়াশায় কুয়াশা। পি. টি. স্কুলের ভাঙা বেঞ্চে বসা আমরা, ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে সুফী স্যার। প্রিয় সাইকেলটি নিয়ে সাতমাথার মোড় পেরিয়ে যাচ্ছি...

ঘুম ভেঙে যায়, তবু অসম্ভব স্বপ্নের ঘোরে বিছানায় পড়ে থাকি। একটিমাত্র মহার্ঘ্য জীবন কতো বিচিত্র আলোছায়ায় মিলেমিশে যাপিত হয়। যা পেছনে ফেলে এসেছি, যা আর ফিরে পাওয়া কোনোদিন হবে না – তাই দিয়ে স্বপ্নের বুনন চলতে থাকে। পরবাসী নিঃসঙ্গ আমি, বাকি জীবনটিও এইভাবে অতিবাহিত হবে। একসময় চলে যাবো এই জীবন ছেড়ে। পরবাসে কারো মৃত্যু ঘটলে তার সম্প্রদায়ের মানুষেরা মৃতের নশ্বর দেহটি দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করে থাকে। বেশিরভাগ পরবাসী মানুষ স্বদেশে সমাহিত হওয়ার বাসনা পোষণ ও প্রকাশ করে, মৃত্যুর পরে হয়তো পারিবারিক সমাধিস্থলে বিগত প্রিয়জনদের সাহচর্যে নিজেকে স্থাপিত করতে চায়। আমিও কি তাই চাইবো? অর্থহীন মনে হয় – কী হবে, নিশ্চল অনুভবহীন একটি শরীরই শুধু আমার দেশের মাটিতে পৌঁছবে, আমি তখন আর আমি নই – নশ্বর ও পচনশীল প্রাণ-পরিত্যক্ত একটি মনুষ্যদেহমাত্র। আর কিছু নয়। কী কানাকড়ি মূল্য আছে তার? একেক সময় মনে হয়, জীবনটি হয়তো অন্যরকম হতে পারতো! হলে তা কী রকম হতো? কে বলবে!

There is no air for that mouth
He can't live without a land,
And then he falls to his knees
Not onto native soil, but into death.

রচনাকাল: ডিসেম্বর ২০০৪ – অগাস্ট ২০০৫

ইমেল : mz1971@gmail.com